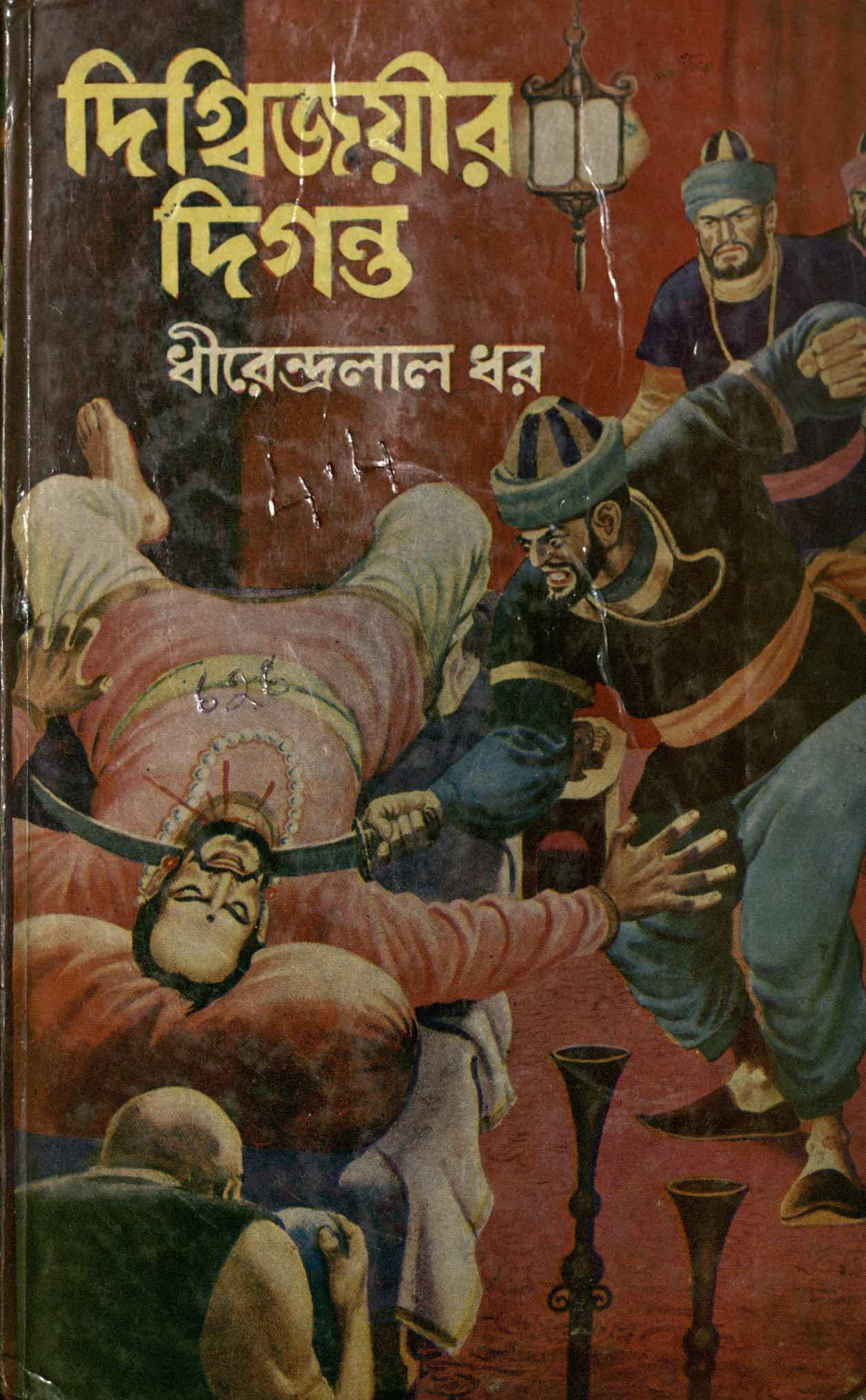
দিগ্বিজয়ীর দিগন্ত

ধীরেন্দ্রলাল ধর



দিগ্বিজয়ীর দিগন্ত

ধীরেন্দ্রলাল ধর



DIGBIJAYIR DIGANTA
(A novel for Children)
by Dhirendra Lal Dhar
Rs. 8·00

তৃতীয় মুদ্রণ :
বৈশাখ, ১৩৯৪
এপ্রিল, ১৯৮৭

Published by—
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3, College Street Market.
Calcutta-700007 (1st floor)

প্রতিষ্ঠাতা :
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা :
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতলে)
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রণে :
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং হাউস
৬৯।১।১বি, বদ্রীদাস-টেম্পল স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদ চিত্র :
নারায়ণ দেবনাথ

পরিকল্পনা :
দিব্যদ্যুতি পাল

প্রচ্ছদ মুদ্রণে :
নিউ গয়া আর্ট প্রেস

আট টাকা মাত্র



দিগ্বিজয়ীর দিগন্ত

অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক। বাদশাহী অবস্থার তখন চরম দুর্গতি। বাদশাহ্ শক্তিহীন। উজির, দেওয়ান, সুবাদার, আমীর-ওমরাহ্ থেকে শুরু করে সমস্ত রাজকর্মচারী ও ক্ষমতাবান পদস্থ ব্যক্তিরা সততা ও কর্মনিষ্ঠা হারিয়ে ফেলছে। পদস্থরা লুঠতরাজ জুলুম-চালিয়ে সম্পদ বৃদ্ধি করছে, নিম্নস্থরা ঘুষ নিয়ে, চুরি করে পয়সা কামাচ্ছে। কিছু বাজে লোক শুধু মোসাহেবি ও দালালি করে নিজের অবস্থা গুছিয়ে নিচ্ছে। আজ যে বন্ধু, অর্থের জন্য কাল তার সাথে শত্রুতা করতে বাধছে না। সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা বাদশাহে্র চারপাশ থেকে শুধু নয়, দিল্লীর জনপদ থেকে যেন হারিয়ে গেছে। ধূর্তামি, নষ্টামি, ষড়যন্ত্র ও গুপ্তশত্রুতা মানুষের গুণ ও বুদ্ধিমত্তা বলে স্বীকৃতি পাচ্ছে। অর্থের মাপকাঠি দিয়ে মানুষের বিচার হচ্ছে, যার যত সম্পদ, সে ততো সম্মানী।

বাদশা মহম্মদ শাহ্ নামেই বাদশা। সিংহাসনে বসে দরবার করেন, হুকুম জারি করেন, কতজনকে সুবাদার করেন, মনসবদার করেন। আর সুবা নিয়ে, জায়গীর নিয়ে, হাজার-হাজার, লাখ-লাখ, টাকা খাজনা আদায় করে। রাজকোষে কিন্তু কেউ আর টাকা পাঠায় না, নিজের ঘরে জমা করে। বাদশার তাই টাকা নেই।

দিল্লীর কেল্লায় আটহাজার বাদশাহী সৈন্য আছে, তারা মাইনে পায় না। মাসে বারো থেকে পনেরো টাকা মাইনে, তাও বারো-তেরো মাসের বাকি পড়েছে। সৈন্যরা কেল্লার ফটকের সামনে এসে হৈ-হল্লা করে, নায়েব-নাজির এসে তাদের হাতে দু'পাঁচ টাকা করে দিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদায় করেন। তারা তখন সুবিধামত লুঠতরাজ ও জুলুম চালায়। বাদশাহী ফৌজকে কেউ কিছু বলতে সাহস করে না। এই অরাজকতাই তখন দিল্লীবাসীদের মেনে নিতে হয়েছে।

অত্যাচারের জন্য বাদশাহে্র দরবারে নালিশ করেও কেউ আজ পর্যন্ত কোন প্রতিকার পায়নি। দু'তিন পুরুষের বাসিন্দা যারা, দিল্লী ছেড়ে সহসা তারা অজানা জায়গায় চলে যেতেও পারে না। শহর ছেড়ে গেলেই যে প্রাণরক্ষা পাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। পথে বেরুলেই সিপাহীর ভয়, ঠগীর ভয়। তারা পরনের জামাকাপড় অবধি কেড়ে নেয়, প্রাণটাও যায় বেঘোরে।

এ এক অদ্ভুত রাজ্য। রাজা থেকেও রাজত্ব নেই, আইন আছে, কিন্তু আইন মানাবার মত রাজশক্তিও নেই। তবু মানুষ সুদিনের আশায় দিন গুণে যাচ্ছে—সাধারণ মানুষের কাছে ভগবানই ভরসা।

দিনে দিনে কিন্তু সঙ্কট বাড়ছে। মারাঠা, রাজপুত, রুহেলা, আফগানী, তুরানী, ঠগী সবাই মিলে টাকা লুটতে ব্যস্ত। সাধারণ মানুষের কথা কেউ আর ভাবছে না।

এই অরাজক আমলের দু'টি দশকের এগারোটি বছর জুড়ে আমাদের এই কাহিনী—১৭৩৭ থেকে ১৭৪৭ সাল অবধি এক সৈনিকের জীবনকথা। সে হলো আমাদের মহাবীর মুনশী।

* * *



এক সৈনিকের জীবন কথা……আমাদের মহাবীর মুনশী। পৃষ্ঠা—৮

ভীম সিং ছিলেন জয়পুরের রাজপুত। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর আকর্ষণ ছিল রাজদরবারের দিকে—রাজসরকারে সে বসে চাকরি করবে। সেজন্য তখনকার দিনের যে শিক্ষা—সাধারণ লিখতে-পড়তে জানা আর টাকা-আনা-পয়সার হিসাব—তার সঙ্গে লাঠিখেলা, অসিখেলা, ঘোড়ায় চড়া ও বন্দুক চালানো সবই সে শিখেছিল, তবে ভাল করে মক্‌শো করেছিল হাতের লেখাটা।

দিনে দিনে তার হাতের লেখা হয়েছিল মুক্তোর মতো।

একদিন জয়পুরের মহারাজকে সে তার হাতের লেখাটা দেখিয়ে বললো—'হুজুর, রাজসরকারের দরবারে আমি একটা কাজ চাই।'

জয়পুরের মহারাজা ভীম সিংকে দরবারে মুনশীর কাজ দিলেন। ভীম সিংয়ের কাজ হলো প্রতিদিন দরবারের সব কথা লিপিবদ্ধ করা।

মহারাজ সেবারে দিল্লী এসেছিলেন বাদশার দরবারে। ভীম সিংও এসেছিল মহারাজার সঙ্গে। তার হাতের লেখার ঢং তখন আরো সুন্দর হয়েছে। বাদশা একদিন সেই হাতের লেখা দেখে বললেন,—'সুন্দর লেখার ছাঁদ তোমার। আমার দরবারের মুনশী হয়ে থাকো।'

এ আশা ভীম সিংয়ের দীর্ঘদিনের। মহারাজকে বলে সে বাদশাহী দরবারের মুনশী হলো। সারা ভারতের কত ঘটনাই তখন থেকে তার কলমে লিপিবদ্ধ হতে থাকলো। কত রাজা-মহারাজা, আমীর-ওমরাহকে সে দেখতে লাগলো প্রতিদিন। অল্পকালের মধ্যেই লোকে তার আসল নাম ভুলে গেল, পরিচিত হলো সে 'দরবারী-মুনশী' বলে।

কিছুদিন আগে মারাঠীরা দিল্লীতে প্রচণ্ড উৎপাত করে। সেই সময় মুনশীজীর বাড়ীও তারা লুঠ করে। কিন্তু লুঠ করে সোনা-দানা কিছু না পেয়ে মারাঠী সর্দার বলে,—ব্যাটা দরবারী মুনশী, ব্যাটার ঘরে দু'-দশখানা মোহর নেই তা কি হয়? মাটির নীচে কোথাও লুকানো আছে। দু'-চার ঘা পিঠে পড়লেই মুখ খুলবে।

মারাঠীরা মুনশীজীকে বেদম প্রহার করে। ভীম সিংয়ের ডান হাতে বিশেষ চোটে লাগে। সে হাত আর ভাল হয়নি, লিখতে গেলে হাত কাঁপে। যে লেখার জন্য তার এত কদর, সেই লেখাই বিগড়ে

গেলো। চাকরি আর রইলো না। বাদশা ভীম মুনশীর পেন্‌সনের ব্যবস্থা করে দিলেন—মাসিক ত্রিশ টাকা।

কিন্তু সে টাকা পুরো মুনশী হাতে পায় না। বাদশাহের মীর-বকসীর সই হয়ে নগদ টাকা হাতে নিতে নিতে মধ্যপথে তিনজন কর্মচারীকে দস্তুরি দিয়ে খুশি করতে হয়।

তাতে শেষ অবধি মাসে পঁচিশটি টাকা হাতে আসে।

সেই টাকাও আবার সবসময় ঠিকমত জোটে না। বাদশার কোষা-গার শূন্য। ফৌজরাই মাইনে পায়নি একবছর, তারা তো কাজ করছে আর মুনশীজীর তো পেনসন, কাজের সে বাইরে। তাই মাসিক বরাদ্দ টাকা মুনশীজী কখন তিনমাসে কখন বা চারমাসে একবার পান।

শেষে মুনশীজী একদিন দেখা করলো বাদশার সঙ্গে, বললো—'জাঁহাপনা, আমি তো উপোস করার অবস্থায় আছি, আমার ছেলেকে যা হয় একটা কাজ দিন।'

বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার ছেলে তোমার কাজটা করতে পারবে? হাতের লেখা কেমন?

ভীম সিং বললো—হুজুর ছেলেটা লেখাপড়ায় তেমন ভালো না, তবে তলোয়ার চালাতে, বন্দুক ছুঁড়তে ভালো জানে। ঘোড়ার পিঠে বসেই বন্দুক চালাতে পারে।

—তাহলে তাকে ফৌজে ভর্তি করে দাও—বাদশা বললেন—সওয়ারী ফৌজে মাসে ত্রিশ টাকা করে পাবে।

ভীম সিং হাতজোড় করে বললো—হুজুর, একটাই মাত্র ছেলে। ফৌজে ভর্তি করতে ভয় করে। কখন জান্ চলে যাবে, বুড়ো বয়সে আমাদের দেখবার কেউ থাকবে না। আপনি ওকে পাহারাদারির কোনো কাজে মোতায়েন করে দিন হুজুর।

বাদশা ক্ষণেক কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—বেশ, আমি তাকে তোষাখানার পাহারাদার করে দেবো। তুমি তাকে একবার এনো দিকি আমার দরবারে।

—বাইরের ফটকে তাকে রেখে এসেছি হুজুর, আপনার হুকুম

পেলে এখনি নিয়ে আসতে পারি।

—নিয়ে এসো।

ভীম সিং তখনই ছুটে গিয়ে ফটকের সামনে থেকে ছেলেকে ডেকে নিয়ে এলো। মহাবীর সিং কুর্নিশ করে বাদশার সামনে দাঁড়ালো।

বাদশা দেখলেন বছর সতেরো-আঠারোর জোয়ান ছেলে, গৌরবর্ণ, পেশীবহুল দেহ। বাদশা বললেন—এ তো নেহাৎ ছেলেমানুষ। রাতে তোষাখানার পাহারাদারি করতে পারবে, ভয় করবে না ?

মহাবীর জবাব দিলো—কেল্লার মধ্যে ভয় কি হুজুর! এখানে হুজুরের ফরমাশ্‌ পেলে আমি কিছুই পরোয়া করি না।

—সারারাত জাগতে হবে, দিনের পর দিন রাত জাগতে পারবে ?

—নোকরকে আপনি যা হুকুম করবেন, তাই করবো। দিনে ঘুমুবো, রাতে জাগবো।

—ভাঙ্‌ খাওয়ার অভ্যাস আছে ?

—না, হুজুর।

—মাঝে মাঝে রাতে আমি খবরদারি করতে বেরোই। যদি কোনোদিন দেখি তুমি ঘুমুচ্ছো, তাহলেই নোকরি খতম হয়ে যাবে।

—কোনোদিন ঘুমুবো না, হুজুর।

ভীম সিং মুনশীর ছেলে মহাবীর সিং মুনশীর বাদশাহী দরবারে চাকরি হয়ে গেলো—রাতে তোষাখানা পাহারা দেওয়ার।

* * *

চাকরি তো হলো, কিন্তু বেতন কই ? দিন আর চলে না।

রাজপ্রাসাদের কর্মকর্তা মীর-বকসীকে টাকার কথা বললে, পাঁচ টাকার বেশি পাওয়া যায় না। দিনে দিনে সেই পাঁচটি টাকাও আবার হু'টাকা, নয়তো তিনটাকায় নেমে আসে।

ওদিকে মুনশী সাহেবের ভাতাও তো মাসের পর মাস পাওয়া যায় না। রাজকোষে টাকা নেই। সৈনিকরা মাঝে মাঝে বেতন না পাওয়ার জন্য গোলযোগ বাধিয়ে কিছু টাকা আদায় করে নেয়, তাছাড়া নাগরিকদের কোন কোন পল্লীতে লুঠতরাজ করেও তারা পুষিয়ে নেয়।

কিন্তু মহাবীর সিং কি করবে ? সে তো সৈনিক নয়।

মহাবীরের দিন চলে না। মুদি বলে দিয়েছে, নগদ দাম না দিলে আর মাল দেবে না। সামান্য লকড়িওয়ালাও এখন শক্ত কথা বলতে ছাড়ে না। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে—ঠেলায় কাঠ আনছিলাম মুনশীজী, পথে ফৌজী সিপাইরা গাড়ী লুঠ করে নিলে, তুমি দুপুরে না ঘুমিয়ে আমার সঙ্গে চলো, ঠেলায় করে গাছ কেটে আনবো, তুমি বন্দুক নিয়ে সঙ্গে আসবে। সিপাহী সঙ্গে দেখলে আর লুঠ হবে না। আমি একমণ কাঠ তোমায় এমনি দেবো।

মহাবীরের সম্মানে ঘা পড়ে। বাদশাহে্র তোষাখানার পাহারাদার সে, একজন সামান্য লকড়িওলা তাকে কাঠ-পাহারাদারের কাজ করতে বলে! সে ধারে কাঠ নেয়, টাকা বাকি রাখে বলেই তো কাঠওয়ালা একথা বলার সাহস পেয়েছে। নাঃ, এ অবস্থার একটা প্রতিকার তাকে করতেই হবে। বাড়ী এসে মহাবীর বললো—রান্নার কাঠ আজ আর পাওয়া যাবে না।

মা বললো—কাঠ পেলেই বা কি হবে, আটা তো নেই, ডালও নেই, রাঁধবো কি ? আমি তাই সকালেই বাসনওয়ালার কাছে একখানা থালা বেচে এসেছি। সে পয়সা দিয়ে ছাতু এনেছি, লংকা এনেছি, এবেলা-ওবেলা চলে যাবে, কালও সকালে খাওয়া হবে। কাল যে-ভাবেই হোক মীরবকশীকে বলে দু'-তিন টাকা নিয়ে আসার চেষ্টা করিস্।

মহাবীর বললো—টাকা ওরা দেবে না। বাদশার টাকা নেই।

মা বললো—নোকর-চাকরকে দিয়ে কাজ করাবে আর মাইনে দেবে না ? বাদশার টাকা নেই, মোহর আছে, হীরে-জহরৎ আছে। হীরে-জহরৎ বেচে লোকের মাইনে দিক্, নইলে বাদশাহী তখ্ত ছেড়ে বনে চলে যাক্। এমন বাদশাহে্র দরকার কি ?

মহাবীর বললো—হীরে-জহরৎ বাদশা বেচতে পারবে না, বেচবো আমরা। আমরা তো তোষাখানায় পাহারা দিই, আমরাই হীরে-জহরৎ লুঠ করবো। না খেয়ে তো আর দিন চলবে না। দু'-তিন টাকা ভিক্ষে নিতে ইচ্ছে করে না।

ভীম সিং দাওয়ার উপর চারপায়ায় বসেছিলো, বললো—হুঁশিয়ার হয়ে কথা, বল রে! এ কথা বাদশাহে্র কানে গেলে নোকরি যাবে।

মহাবীর বললো—নোকরি কোথায়? এ তো বেগার কাজ।

—হিন্দুস্থানের বাদশাহের নোকরি, এর তলবের কি কোন মার আছে? এ টাকা তো একদিন না একদিন পাওয়া যাবেই।

—সে তো দেখছি, তুমি একবছরে ভাতার একটি টাকাও পাওনি। না খেয়ে মারা গেলে টাকায় আর কি হবে? আর টাকা তখন দেবেই বা কে? নেবেই বা কে?

—সবই নসীব। তকদিরে যা আছে, তা তো ভুগতে হবেই।

—আমি আজ রাতেই নসীব বদল করবো।

—কি করবি? তুই একা কি করতে পারিস্?

—কাল সকালে দেখবে কি করেছি।

—চুরি করবি নাকি? না, ডাকাতি?

—যা করবো, কাল সকালে দেখবে। উপোস করে আমি বাদশাহী নোকরি করবো না।

—কোন গোলমাল-হাঙ্গামে যাস্ না রে বেটা। হুজ্জোতের মধ্যে পড়লে জান্-মান দুই যাবে, পেটও ভরবে না।

মহাবীর সে কথার জবাব দিলে না। ঘরের মধ্যে চলে গেলো।

* * *

দেওয়ান-ই খাসের পাশে যে পথটি সোজা কেল্লার পাঁচিলের পাশে চলে গেছে, সেইখানেই পাঁচিলের ধার দিয়ে কয়েকখানি ঘর। সেই ঘরের নীচেই তোষাখানা। একটা ছোট দরজা আছে, সেই দরজা দিয়ে নীচে নেমে যেতে হয়। সেই দরজায় একটা মস্ত তালা ঝোলানো আছে। একমাত্র মীরবকসীর কাছে আছে তার চাবি। প্রয়োজন মত তালা যখন খোলা হয়, তখন চারজন কৃপাণধারী খোজা দাঁড়িয়ে যায় দরজার দু'পাশে, মীরবকসী একা ঢুকে যান, একা বেরিয়ে আসেন।

বাইরে থেকে ভিতরটা অন্ধকার দেখায়, কিন্তু মীরবকসী কখনো কোন সময় একটা লণ্ঠন নিয়েও নামেন না।

যাক্ সে কথা, তোষাখানায় হীরে-জহরৎ বা মোহরের সঞ্চয় কতো আছে, তা মীরবকসী ছাড়া আর কেউ জানে না। মীরবকসী আজ অবধি কাউকে সঙ্গে নিয়ে নীচে নামেন নি।

রাতে এই তালাবন্ধ দরজাটাই মহাবীরকে পাহারা দিতে হয়। কখনো সে বসে থাকে, কখনো-বা ঘুম পেলে পায়চারি করে। দুপুর রাতে প্রাসাদ যখন নিঝুম হয়ে অন্ধকারে ডুবে যায়, তখন মহাবীরের আগে গা ছম্‌ছম্ করতো, দিনে দিনে এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। আগেকার সেই নিঃসঙ্গ ভয়টা এখন আর নেই।

আজ সন্ধ্যার পর পাহারা দিতে এসে মহাবীর সিং তালা বন্ধ দরজাটার পাশে চুপচাপ বসে রইলো। ঘণ্টখানেক বসে বসেই কেটে গেলো। কেল্লার ফটকে রাত প্রথম প্রহর শেষ হবার ঘণ্টা বাজলো। মুক্ত কৃপাণ কাঁধে নিয়ে সর্দার খোজা তদারক করে গেলো—'পাহারাদার মুনশীজী!'

মহাবীর উঠে দাঁড়ালো, জবাব দিলো—'সেলাম!'

'—খোদা হাফেজ!' সর্দার খোজা এগিয়ে গেলো।

মহাবীর কয়েকবার পায়চারি করলো। এদিকে এখন আর কেউ আসবে না। আবার সেই রাত বারোটায় সর্দার খোজার খবরদারি।

মহাবীর বসলো। কুলুপ দেওয়া দরজার উপরের পাথরখানা হাল্কা। সেই পাথরখানার জোড়ের মুখে একখানি ছোরা দিয়ে সে ঘষতে শুরু করলো। এই পাথরখানা তুলে ফেলে সে তোষাখানায় ঢুকবে। আজ রাতেই ঢুকবে, যা পাবে নেবে। যদি নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, তাহলে সারাজীবন আর খাওয়া-পরার কথা ভাবতে হবে না। আর যদি ধরা পড়ে, এই দুনিয়া থেকেই তার ছুটি হয়ে যাবে। তাতেও খাওয়া-পরার ভাবনা আর থাকবে না।

রাত দুপুরের ঘণ্টা বাজলো, মহাবীর দাঁড়িয়ে উঠে পায়চারি শুরু করলো। খিলানের আড়াল থেকে দেখা গেলো সর্দার খোজার তলোয়ারখানা চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে। সর্দার খোজা সামনে এসে হাঁক দিলো—'মুনশীজী পাহারাদার।'

'—সেলাম।'

'—খোদা হাফেজ!' সর্দারের ছায়া খিলানের আড়ালে হারিয়ে গেলো।

মহাবীর আবার ছোরা ঘষতে বসলো। রাত তৃতীয় প্রহরের ঘণ্টা যখন বাজলো, তখন ইস্পাতের ছোরার তীক্ষ্ণ ফলা পাথরখানার চারপাশে ঢিলা করে ফেলেছে। সর্দারজীর তদারকির পর পাথরের ফাঁকে ছোরা ঢুকিয়ে দিয়ে মহাবীর চাড় দিতে শুরু করলো। পাথরখানি নড়ে উঠলো। মহাবীরের গায়ে ক্ষমতা ছিলো, দু'হাতে সে পাথরখানি তুলে ফেললো। ছোট একখানি টালি, একটি মানুষ গলে যাবার পক্ষে পর্যাপ্ত। মহাবীর ফোকর দিয়ে নীচে নেমে গেলো।

মহাবীরের জেবে ছোট ছোট কাঠির মুখে কাপড়-জড়ানো তেলে-ভেজানো কাঠি ছিলো। চকমকি ঠুকে সে একটি কাঠি জ্বাললো। সেই আলোয় দেখলো সামনে দু'জন মানুষের চলার মত পথ। সেই পথে কয়েক হাত গিয়েই এক খিলান। খিলান পার হয়েই বড় দালান, দালানের গায়ে সারি সারি কাঠের সিন্দুক, ডালায় বড় বড় কুলুপ আঁটা। এই তালা এখন ভাঙতে হবে—এ তো অনেক সময় লাগবে। তা'হলে? নজরে পড়লো একধারে কয়েকটা মাটির কলসী রয়েছে।

মহাবীর সেইদিকে গেলো। কলসীগুলি মোহরে ভরা।

মহাবীর আর চিন্তা করলো না। মুঠো-মুঠো মোহর তুলে জামার দু'টি জেব ভর্তি করলো। তারপর ফিরে এলো আবার সেই ফোকরের মুখে।

লোহার আঁকশিতে সে দড়ি বেঁধে এনেছিল। মাথার উপর ছুঁড়ে দিল আঁকশি। বার পাঁচেক ছোঁড়ার পর আঁকশিটা আটকালো। মহাবীর সেই দড়ি ধরে উপরে উঠতে শুরু করলো।

ব্যস্ততার মধ্যে মহাবীর কিন্তু ভুল করলো—আঁকশিটা শক্ত হয়ে আটকেছে কিনা দেখেনি। ফোকরের মুখোমুখি তখন প্রায় সে উঠে এসেছে, এমন সময় হাত বাড়িয়ে ফোকরের কিনারা ধরতে গিয়ে হাতটা পিছলে গেলো, দড়িটা দুলে উঠলো, পরক্ষণে কট্ করে খুলে গেলো আঁকশিটা। ধুপ্ করে মহাবীর পড়ে গেলো ফোকরের মধ্যে।

তখনই সামলে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখলো ডান পা আর

ফেলতে পারছে না। ফেলতে যেতেই পায়ের 'গোছ' ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো। তাড়াতাড়ি পা মালিশ করে নিয়ে মহাবীর আঁকশি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেলো, কিন্তু মালিশ করার ফলে এবার পায়ের মধ্যে শুরু হলো যন্ত্রণা। কে যেন পায়ের মধ্যে সূচ বিঁধিয়ে দিচ্ছে মনে হয়। মাঝে মাঝে যন্ত্রণাটা চিড়িক দিয়ে উঠছে কোমর অবধি।

এক পায়ে দাঁড়িয়েই মহাবীর আঁকশি ছুঁড়লো। এবার প্রথম বারেই আঁকশিটা আটকালো। মহাবীর আর ভুল করলো না। দড়ি টেনে দেখলো। তারপর কোনমতে উপরে উঠে এলো।

পাথরখানাও সে যথাযথ উপরে লাগিয়ে ফোকর বন্ধ করে দিলো। পাথরের ফাঁকের ধুলোবালিও রুমাল দিয়ে হটিয়ে দিলো। কিন্তু তখন আর তার নড়ার শক্তি নেই। পায়ের যন্ত্রণা মাথায় উঠে গেছে। বিষম চিড়িক-চিড়িক করছে মাথার মধ্যে। পা একটু নাড়লেই অসহনীয় যন্ত্রণা। মহাবীর সেইখানেই শুয়ে পড়লো।

* * *

ভোর হয়ে আসছে। কিন্তু মহাবীর শুয়ে আছে নিশ্চল।

ভোরের আলোয় পূর্বাকাশ ফর্সা হবার মুখেই সর্দার খোজা নিয়মিত দেউড়িতে আসে সানাইওয়ালার খবরদারি করতে। সানাইওয়ালা দেউড়ির মঞ্চেই ঘুমোয়, সর্দার তাদের ডেকে দিয়ে আসে। ঊষার আলোয় সারা আকাশ যখন সাদা হয়ে যায়, পূর্বদিকে লাল আভার আভাস জাগার মুখেই দেউড়ির সানাই বেজে ওঠে।

তারপর সর্দার খোজা রাতের পাহারাদারদের খবরদারি করে ছুটি দিয়ে দেয়। সেদিনও যথারীতি কোষাগারের কাছে এসে সর্দার খোজা হাঁক দিলো—'পাহারাদার মুনশীজী!'

কিন্তু মুনশীজী দাঁড়ালো না, সাড়াও দিলে না।

'—মুনশীজী!' সাড়া নেই।

সর্দার খোজা কাছে এসে দেখলো, মুনশীজী পড়ে আছে, জ্ঞান নেই।

* * *

বাদশা মহম্মদ শাহ্ দেওয়ান-ই আম-এ আর বসেন না। বিশেষ

ব্যাপার না থাকলে বসে কি হবে! দরবারের কোন জৌলুস নেই, সামন্ত রাজারা আসে না, সুবাদাররা আসে না, কখন-বা প্রধান উজিরকে ডেকে পাঠাতে হয়। শুধু কয়েকজন কর্মচারী নিয়ে আম্-দরবার হয় না।

বাদশা সকালে দেওয়ান-ই-খাস্-এ বসেন। ছোট ছোট ঘরোয়া ব্যাপার খাস্ দরবারেই সম্পন্ন হয়।

সেদিন দরবারে বসতেই বাদ্শার নজরে পড়লো, দালানের নীচেই চারজন খোজা একটি ঝোলা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরক্ষণেই সর্দার খোজা আ-ভূমি কুর্নিশ করে সামনে এসে দাঁড়ালো।

বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কি?

—হুজুর, চুরি।

—চুরি?

—তোষাখানার পাহারাদার মহাবীর মুন্শী তোষাখানা থেকে মোহর চুরি করেছে, তার পিরাণের জেব মোহরে ভর্তি। পালাবার সময়ে পায়ে চোট লেগে সে পড়েছিলো তোষাখানার দরওয়াজার পাশে। তাকে ঝোলায় নিয়ে এসেছি।

—মহাবীর মুন্শী? ভীম মুন্শীর ছেলে?

—জী, খোদাবন্দ!

বাদশা ইসারা করলেন। ঝোলা-বাহকরা ঝোলা নিয়ে এগিয়ে গেলো। দেওয়ান-ই-খাসের চত্বরে উঠে, কিছুটা সামনে গিয়ে ঝোলা নামালো।

বাদশা ডাকলেন—মহাবীর!

ইতিমধ্যে পায়ে ফেট্টি বেঁধে, চোখেমুখে জল দিয়ে মহাবীর কিছুটা সুস্থ হয়েছে। তাড়াতাড়ি সে ঝোলার উপরেই উঠে বসলো, বসে বসেই মাথা নামিয়ে বাদশাকে কুর্নিশ করলো।

বাদশা বললেন—মহাবীর, তুমি তোষাখানায় চুরি করেছো?

মহাবীর জানে, তার আর মুক্তি নেই, শিরশ্ছেদ সুনিশ্চিত। রাজপুত সে, বেপরোয়া—সত্যি কথাই বলা ভাল। বললো—হ্যাঁ হুজুর!

—তোষাখানার তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকেছিলে?

—না হুজুর, দরওয়াজার উপরের পাথর কেটে ভিতরে ঢুকেছিলাম।

—কি নিয়েছিলে ?

—শুধু মোহর, হুজুর।

—পালাবার সময় তোমাকে সর্দার খোজা ধরেছে ?

—না হুজুর, আমার নিজের বুদ্ধির দোষে আমি পা ভেঙে ধরা পড়েছি—মহাবীর ঘটনাটি বললো।

বাদশা বললেন—তুমি যেখানে চোর ধরবে, সেখানে তুমিই চুরি করলে ? আর কোথাও চুরি করার জায়গা পেলে না ?

—হুজুর, আর কোথাও চুরি করলে আমার পাপ হতো। এখানে আমি চাকরি করছি, একবছর হলো মাইনে পাচ্ছি না। কাল আমার বাড়িতে রসুই হয়নি, মুদি ধার দিচ্ছে না, কাঠওয়ালা লকড়ি দিচ্ছে না, আমার মা আমাদের খানা-খাবার থালা বিক্রি করে ছাতু কিনে এনেছে। আজ আর ঘরে খাবার নেই। অথচ এখানে আমি লাখ-লাখ মোহরের তোষাখানার পাহারা দিচ্ছি। আমার পাওনা তো এখান থেকেই। তাই চুরি করলে এখান থেকেই পাওনা চুরি করতে হবে। তাই এখানেই চুরি করেছি, হুজুর।

—চুরির সাজা তুমি জান ?

—জানি, হুজুর। আমি মরলে আমার এই ঝামেলা আর থাকবে না, হুজুর। নোকরি করে পয়সা পাবো না, বুড়ো বাপ-মাকে উপোসী রাখবো—এ অশান্তি আর থাকবে না। মরলে আমি বেঁচে যাবো।

বাদশা খানিকক্ষণ কি ভাবলেন তারপর বললেন—তোমার চুরি করা মোহরগুলি কোথায় ?

—আমার কুর্তার জেবে রয়েছে, হুজুর।

—বারো মাসের মাইনে কত ?

—তিনশো টাকা।

—দশখানা মোহর তুমি তা'হলে নিয়ে নাও, বাকি মোহর জমা করে দাও মীরবকসীর কাছে। পা সেরে গেলে তুমি আবার যথারীতি তোষাখানায় পাহারা দেবে।

—হুজুর খোদাবন্দ!

—কি?

—আমার প্রাণদণ্ড?

—না, তোমার মত সত্যবাদী মানুষ আজ আমার দরকার। আমার কর্মচারীদের মধ্যে তোমার মত মানুষ বেশি নেই। তোমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলে একজন নির্ভীক কর্মচারীকে আমি হারাবো।

—হুজুর খোদাবন্দ!

বাদশা ইসারা করলেন। খোজারা ঝোলা কাঁধে তুলে নিলো।

মহাবীরের পা ভাঙেনি। পতনের ফলে পায়ের গোছের হাড় মচ্‌কে গিয়েছিল, এবং তা মচ্‌কে ছিল ভালভাবেই।

ভীম সিংয়ের সঙ্গে বাদশাহে্‌র হেকিমের খাতির ছিলো। ভীম সিং ছেলেকে পালকি করে নিয়ে গেলো হেকিম সাহেবের কাছে। হেকিম সাহেব দেখে-শুনে মালিশ দিলেন আর বলে দিলেন হাড়ভাঙা-পাতা দিয়ে বেঁধে রাখতে। সেই হাড়ভাঙা-পাতা যোগাড় করতেই ভীম সিংয়ের পুরো একটা দিন লেগে গেলো। তা যাক্‌, হেকিম সাহেবের মলমটা কিন্তু কাজের, সামান্য আল্‌তোভাবে বুলিয়ে দিলেই সব যন্ত্রণা যেন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। দিন পনেরো বিছানায় পড়ে থাকার পর, তবে মহাবীর মাটিতে পা ফেলে দাঁড়াতে পারলো।

রীতিমতো চলাফেরা করতে মহাবীরের লাগলো আরো দিন পনেরো।

তারপর একদিন মীরবকসীর কাছে গিয়ে মহাবীর সেলাম ঠুকে বললো—হুজুর, আমি সুস্থ হয়েছি।

সেই রাত থেকে মহাবীর আবার পুরানো কাজে বহাল হয়ে গেলো।

রাতে খোজা সর্দার তদারকি করতে এসে বললো--বাদশাহী মহলে চুরি করে আজ অবধি কেউ মাথা বাঁচিয়ে ফিরতে পারেনি। তোর নসীবের আমি তারিফ করি, মহাবীর। তোর কথা শুনে বাদশা খুশি হয়েছেন। তোর কথা বলার বাহাদুরি আছে।

মহাবীর বললো—খেতে না পেলে কি করবো বলতো, সাহেব?

—যাক্‌, আবার যেন চুরি করিস্‌ না।

—আর জরুরৎ হবে না। একবছরের মাইনে পেয়ে গেছি, এখন ছ'মাস আর অভাব থাকবে না। ছ'মাস এখন ফুর্তিতে কাজ করবো।

—ছ'মাস!—খোজা সর্দার হাসলো—ছ'সপ্তাহ কাজ করতে হবে না। ইরাণের সুলতান ফৌজ নিয়ে আসছে, আর ক'দিনের মধ্যে তারা দিল্লীতে চড়াও হবে। তাদেরকে রোখবার মত মানুষ কেউ নেই।

—বাদশা লড়বেন।

—বাদশা কি লড়বেন? তিনি লড়াই করতে পারলে আজ দিল্লীর এমন অবস্থা হয়? উজির, আমীর-ওমরাহরা কেউ তাঁকে ভয় করে না। সবসময় তারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করছে। আর সেই সুযোগে রাজপুত, মারাঠা আর জাঠেরা লুঠতরাজ চালাচ্ছে। নাদির শাহে্র সামনে রুখে দাঁড়াবার মত মানুষ কই? সে রকম লড়িয়ে সেনাপতি কই?

—তাহলে লড়াই হবে না?

—মনে হয় তেমন কিছু হবে না, নাদির শাহ্ সোজা এসে দখল করবে দিল্লী।

—তাহলে কি আবার নতুন বাদশাহী শুরু হবে?

—সে খোদা জানেন। যাক্, এসব কথা নিয়ে তুমি আবার যেন কারও সঙ্গে আলোচনা করো না। এখানে কোন মানুষকে বিশ্বাস নেই। আজ যে বন্ধু, কাল সে শত্রু। নিজে সাবধানে থেকো। তেমন লুঠতরাজ দেখলে পালানোর পথ রেখো।

—আপনার বহুত মেহেরবানি, আপনার উপদেশ আমার মনে থাকবে।

কিন্তু সাবধান হতে গেলে, যা করা দরকার তার অবকাশ পেলো না মহাবীর সিং। কেল্লার মধ্যে মহাবীর কারও সঙ্গে বিশেষ মেলমেশা করতো না। ভীম সিং তাকে সাবধান করে দিয়েছিল—ওখানে কাউকে বিশ্বাস করিস্ না। বাদশাহী কর্মচারীদের মধ্যে সাচ্চা মানুষ খুব কম আছে। তাছাড়া রাতের কাজ, তখন আর কথা বলার মানুষ কোথায়!

সকালে বাড়ী ফিরে সারা দুপুরটা তো ঘুমিয়েই কাটে।

বিকালের দিকে একবার বেরোয়, হরবংশ সিংয়ের বাড়ী যায় তামাক খেতে। বাড়ীতে বুড়ো বাপের সামনে সে তামাক খেতে পারে না। তখনই হরবংশ আর তার ভাই নারায়ণপ্রসাদের সঙ্গে দু'চারটে কথা হয়।

ওরা দু'ভাইও কেল্লার পাহারাদার। তবে ওদের কাজ সকালে, উজিরী দপ্তরখানার ফটকে।

দু'দিন পরেই হরবংশ বললো—এবার দিল্লী থেকে পালাতে হবে। ইরাণের সুলতান আসছে। একবার জিততেই সে তো আগে হিন্দুদের গর্দান নেবে, তারপরে অন্য কথা।

মহাবীর বললো— সে কি খুব ভাল লড়িয়ে? শুনেছি তো তার সৈন্য খুব কম।

—তাতে কি? নাদির শা, জবরদস্ত লড়িয়ে। পাঞ্জাবের সুবাদার তাকে ঠেকাতে পারেননি, তাকে রুখবে আমাদের এই বাদশা! সারাদিন তো গাঁজা খান বসে শুনি, আর বিকালে আফিম। নেশাখোরের কি কোনো হিম্মত থাকে!

—ইরাণের শা, তাহলে দিল্লী দখল করে ফেলবে বলছ?

—আমার তো তাই মনে হয়। তারপর উজির কামরুদ্দিন সাহেব তো মদেই ডুবে আছেন। মদ ছাড়া তিনি আর কিছুই বোঝেন না। লড়াইটা করবে কে? আমাদের সৈন্য আছে, হাতিয়ার আছে, কামান আছে, হাতী আছে, কিন্তু তাদেরকে চালাবার মানুষ নেই। কাজেই আগে থেকে সরে পড়াই ভালো। অনেক দিন মাইনে-পত্তর পাইনি, হাতে পয়সা নেই, পথে বেরুলেই তো টাকার দরকার। তাই ভাবছি, কাল বাসন-কোসন, খাটিয়া-উটিয়া সব বেচে দিয়ে দু'ভাই পরশু সকালেই সরে পড়বো।

—বাদশাহী নোকরির কি হবে?

—যে নোকরিতে এক বছর মাইনে-পত্তর কিছু মেলেনি, সে নোকরি করে লাভ কি? শুধু কেল্লার সিপাই, বলে লোকে খাতির করে, তাই এতদিন টিঁকে আছি। তুমিও বাপ-মাকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলো। পরে আর সরে পড়ারও ফুরসৎ পাবে না।

—দেখি, বাবাকে বলি।

—আজই বলো, আর দেরি করো না।

নারায়ণপ্রসাদ কোথায় গিয়েছিল, ফিরে এলো, বললো—খবর আছে। বাদশা আজ দুপুরে ফকির সাহেবদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনজন পীরই বলেছেন, লড়াই হবে।

—হারজিতের কথা কিছু বলেন নি?

—শা' মুবারক বলেছেন, হারজিত খোদার মর্জি। শা' বন্দা বলেছেন, এ খুনের নেশা, নেশা মিটে গেলেই শা' ফিরে যাবে। আর শা' রামজ্ বলেছেন, বাদশাহে্র বাদশাহী ঠিক থাকবে।

—বাদশাহী ঠিক থাকবে, খুনের নেশা মিটে যাবে, তাহলে তো লড়াই হবে এবং বাদশাই জিতবেন, তাহলে মুবারক শা' হারজিত খোদার মর্জি বললেন কেন? মুবারক শা'র কথা শুনলে তো মনে হয়, বাদশা হেরে যাবেন। হেরে গেলে বাদশাহী ঠিক থাকবে কি করে?

—তা জানি না। যা শুনলাম তাই বলছি। পীর সাহেবদের কথা শুনে বাদশা লড়াইয়ের জোগাড় করছেন। লড়াই হবে।

—এমনিতেই তো সপ্তাহে দু'-চার টাকা পাই, লড়াই হলে সেটাও আর পাবো না, তার চেয়ে আগে-ভাগেই সরে যাওয়া ভাল। মহাবীর তুমিও চলো, দিল্লীতে এবার জান্-মান বাঁচানো মুস্কিল হবে।

মহাবীর বললো—বাবাকে বলি, দেখি তিনি কি বলেন।

আরেক কল্‌কে তামাক শেষ করে মহাবীর পান চিবুতে চিবুতে বাড়ী ফিরলো। ভীম সিং দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিলো। মহাবীর তাকে সব কথা বললো।

ভীম সিং চুপ করে সব শুনলো, তারপর বললো—গোলযোগ বাধলে খুবই মুস্কিল হবে, কিন্তু যাবি কোথায়? পথে বেরুলেই তো ঠেঙ্গাড়ের ভয়। টাকা-পয়সা কিছু থাক্ বা না থাক্, আগে তো খুন করবে, তারপর অন্য কথা। পথে ঠগী-ঠেঙ্গাড়ের হাতে খুন হওয়ার চেয়ে এখানে থাকাই ভাল। নগরে আরো মানুষ তো থাকবে, তাদের যা হবে, আমাদেরও তাই হবে। মহাদেবের নাম নিয়ে বসে থাকি।

তিনি যা অদৃষ্টে লিখেছেন, তাই হবে। কারও কথা শুনে চললে হবে না। বিপদ এলে নিজেকে বুঝে চলতে হবে।

মহাবীর চিরকালই বাপ-মায়ের অনুগত, কোন সময়েই বাপের মুখের উপর কথা বলে না। তাই চুপ করে রইলো।

ভীম সিং বললো—হাতে তো পয়সা আছে, মাসখানেকের মতো খোরাক কিনে ঘরে রাখ্, যাতে দু'-দশদিন ঘরে বসে থাকতে হলেও উপোস না করতে হয়।

কাজেই মহাবীর যেমন ছিলো তেমনি থেকে গেলো।

*　　*　　*

এদিকে নাদির শা' তখন দিল্লীর কাছে এসে পড়েছেন।

নাদির শা'-এর এই ভারত-অভিযান আকস্মিক নয়।

পারস্যের বাদশা কিছুতেই রাজ্য সামলাতে পারছিলেন না। আমীর-ওমরাহরা তাঁর কথা শুনতেন না। তার উপর রুশ ও তুর্কীদের আক্রমণে প্রজাদের কষ্টের অবধি ছিল না। তুর্কী সেনাপতি নাদির কুলি এই সময়ে ইরাণের শা'কে সরিয়ে দিয়ে সিংহাসন দখল করে বসে হলেন নাদির শা'হ। নাদিরের বাবা ছিলেন চামড়া সেলাই করা দরজি।

শা' হয়েই নাদির রুশ ও তুরস্ককে হটিয়ে দিলেন, তারপর নজর দিলেন আফগানিস্থানের দিকে। আফগান আমীররা ভারতে পালিয়ে আসতে লাগলো। নাদির দূত পাঠালেন দিল্লীর বাদশাহে্র কাছে। তারপর এগিয়ে এলেন পেশোয়ার পার হয়ে লাহোরে।

লাহোরের সুবাদার নাদিরকে সসম্মানে কুর্নিশ জানালো।

নাদির এরপর বাদশাহে্র কাছে আবার দূত পাঠালেন, জানালেন—তোমার ওমরাহ্রা আমার ক্ষতি করছে। তাদেরকে শায়েস্তা করতে আমি যাচ্ছি।

বাদশা লড়াই করার জন্য সৈন্য সমবেত করলেন। কিন্তু ওমরাহ্রা তখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় মেতে উঠেছে। প্রত্যেকে চাইছে অন্যকে জব্দ করতে। তারা গোপনে নাদির শা'-এর কাছে দূত পাঠাতে লাগলো—আপনি আসুন!



লুঠতরাজ শুরু হয়ে গেলো।

নাদির এগিয়ে এলেন। বাদশার ফৌজও গিয়ে পৌঁছালো তিরৌরীর মাঠে। লড়াই হলো। বাদশার সেনাপতি মারা পড়লো, মহম্মদ শা' ভয় পেয়ে পিছু হটে এলেন।

নাদির শা' বললেন—হু' কোটি টাকা পেলে আমি ফিরে যাবো।

বাদশা টাকা দিতে রাজি হলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অযোধ্যার সুবাদার বুরহনুল-মুল্‌ক নাদিরের সঙ্গে দেখা করে বললো—দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে আপনি কি সামান্য ছু' কোটি টাকা চাইছেন! আমি অযোধ্যার সুবাদার, ওই টাকা তো আমিই চেষ্টা করলে আমার সুবা থেকেই দিতে পারি! আপনি একবার দিল্লীতে গিয়ে অবস্থাটা দেখুন, তারপরে টাকা চাইবেন।

নাদির শা' দিল্লী অবধি যাওয়াই ঠিক করলেন। নাদিরের ঘোড়া সওয়ার ছিলো ১,২৫০০০, আর বাদশাহের সৈন্য ছিলো ২,০০,০০০, তাছাড়া কামান ছিলো ৫,০০০, তবু বাদশা নাদিরের অগ্রগতি রুখতে পারলেন না।

কারণ, বাদশার সুবাদার ও সেনাপতিরা ছিলো বিশ্বাসঘাতক।

ছ' দিন পরে নাদির শালিমার বাগানে এসে তাঁবু ফেললেন। বাদশাকে জানালেন—তুমি আমার স্বজাতি, তাছাড়া তুমি তৈমুরলঙ্গের বংশের লোক, তোমাকে আমি সিংহাসন থেকে নামাবো না। যুদ্ধের খরচ নিয়ে চলে যাবো।

ভীরু বাদশা মহম্মদ শা' পরদিন দিল্লীতে নাদিরকে সম্বর্ধনা জানালেন। নাদির শা' বাদশাহে্‌র ময়ূর সিংহাসনে বসলেন। তিনি হলেন বাদশার বাদশা—শাহান শা'।

*　　　*　　　*

পরদিন সকালে হঠাৎ খবর রটে গেলো যে, নাদির শা' মারা গেছেন। দিল্লীর সৈন্যরা তখনই 'মার-মার' করে লাফিয়ে পড়লো বিদেশী সৈন্যদের উপর—যেখানে যত ইরাণী পেলো, মেরে শেষ করে করলো।

পরদিন সকালে নাদির বেরুলেন ব্যাপারটা ঠিকমতো জানতে।

পথে অনেক মৃতদেহ পড়ে ছিলো। নাদির গণনা করিয়ে দেখলেন, তার সংখ্যা ৯০০। ইতিমধ্যে এক অজ্ঞাত সৈনিক আড়াল থেকে নাদিরের উপর গুলি চালালো। নাদিরের লাগলো না, পাশের দেহরক্ষী মারা গেলো।

নাদির এরপর যেন ক্ষেপে গেলেন, বললেন—দিল্লীর বাসিন্দারা সব বদমাস, এদেরকে উচিত শিক্ষা দাও, খুনের বদ্‌লা খুন চাই!

তারপর থেকে শুরু হলো হত্যাকাণ্ড। সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাদিরের সৈন্যরা যাকে সামনে পেলে তাকেই হত্যা করলো। ত্রিশ হাজার নিরপরাধ সাধারণ নাগরিক খুন হলো। বাদশা মহম্মদ শা' তখন অনেক মিনতি জানিয়ে নাদিরকে প্রসন্ন করে সেই ভয়াবহ নরহত্যা বন্ধ করলেন। আর সেই সঙ্গে নাদিরের হাতে তোষাখানার চাবিও দিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে নগরের শবদেহ পচে দুর্গন্ধ শুরু হয়েছে! সৈন্যরা সব মরা একত্র করে, যে বাড়ি থেকে যত কাঠ পেল টেনে এনে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যাবতীয় একসঙ্গে মড়া সব পুড়িয়ে দিলে।

নাদির এবার সুবাদারদের উপর জুলুম শুরু করলেন। অযোধ্যার সুবাদারের কাছ থেকে আদায় হলো ৫০০,০০,০০০ টাকা, ওমরাহ খান দৌরানের কাছ থেকে ৫০০,০০,০০০ নিজামুল-মুল্‌কের কাছ থেকে ১৫০,০০০,০০, কামরুদ্দিন খাঁ-এর কাছ থেকে ১৫০,০০০,০০ টাকা। এ ছাড়া পাঁচ-সাত-দশ লাখ টাকা তো অনেকের কাছ থেকেই আদায় হলো। নাদির ময়ূর সিংহাসন সঙ্গে নিলেন, আর তার সঙ্গে তোষাখানায় হীরে-জহরৎ যা ছিলো তাও নিলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—বাদশা মহম্মদ শা' অযোগ্য লোক, তবু তাঁকে সিংহাসনে রেখে গেলাম তৈমুরের বংশধর বলে, আর বাদশাহের কর্মচারীদের মধ্যে তিনটি ওমরাহ মাত্র বিশ্বাসী, নাসির খান, খান দৌরান ও মহম্মদ খান। বাকি সবাই নেমকহারাম। নিজামুল-মুল্‌কের মত ধূর্ত ও স্বার্থপর ওমরাহের গর্দান নেওয়াই উচিত। আমি দয়া করে ওর মাথা নিইনি।

নাদির শা' শুধু সোনা-দানা হীরা-জহরৎ নিয়েই খুশি হননি, তিনি

এ দেশ থেকে নিয়ে যান ১,০০০ হাতি, ৭,০০০ ঘোড়া, ১০,০০০ উট, ১০০ জন খোজা, ১৩০ জন মুনশী, ৩০০ জন মিস্ত্রী এবং ২০০ জন ছুতোর।

যাবার আগে নাদির শা' দিল্লীর বাদশাহী বংশের সঙ্গে একটা কুটুম্বিতার সম্পর্কও করে গেলেন। ঔরংজীবের ছোট ছেলে কমবক্সের নাত্নী, সম্পর্কে মহম্মদ শা'র পিসির সঙ্গে নাদিরের ছোট ছেলে নসরুল্লা-মির্জার বিয়ে দিয়ে গেলেন। দিল্লী যখন হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতায় সন্ত্রস্ত হতচেতন শ্মশানভূমিতে পরিণত, তখন বাদশাহী মহলে আমীর-ওমরাহ'দের মধ্যে বিবাহ-উৎসবের জলুস হলো।

নাদির শা' দিল্লীতে প্রবেশ করেছিলেন ২১শে মার্চ, আর বিদায় নিলেন ১৬ মে, (১৭৩৮ অব্দ)। এই একমাস ছাব্বিশ দিনে দিল্লীর উপর দিয়ে একটা হত্যাকাণ্ডের ঝড় বয়ে গেলো।

* * *

মহাবীর সিং প্রথম কয়েকটা দিন কেল্লা থেকে বেরুতে পারেনি, তাকে ফটকের পাহারাদার বেরুতে দেয়নি।

নাদিরের ছেলের বিয়ের দিন কেল্লার ফটক সকলের জন্য উন্মুক্ত হলো। যে কেউ কেল্লার ভিতরে আসতে পারে বিয়ের সমারোহ দেখতে। অবশ্য ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পরে দিল্লীর কোন নাগরিকের আর বাদশাহী বিয়ে দেখবার মত উৎসাহ তখন ছিলো না। মর্মান্তিক একটা শোকাবহ আবহাওয়া তখন সারা নগরে পরিব্যাপ্ত।

বাদশাহী তোষাখানায় তখন আর বাদশাহী পাহারাদারের প্রয়োজন নেই। বাদশাহে্র যা কিছু ছিল, সবই তো নাদিরের অধিকারে চলে গেছে; নাদিরের বিশেষ ফৌজ কাজিলবাসীরা তার পাহারাদারি করছে, মহাবীর সিং থাক্ আর যাক্ সেদিকে কারও নজর নেই। আমীর-ওমরাহ্ আর ইরানী সিপাইরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। বাদশাহী কর্মচারীদের দিকে কেউ খেয়ালই করছে না।

মহাবীর কোন এক সময় গুটি-গুটি সকলের অলক্ষ্যে কেল্লা থেকে বেরিয়ে গেলো। মা-বাবার জন্য উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় তার মন

ভারাক্রান্ত। দ্রুত পায়ে সে এগোলো ফটক দিয়ে বরাবর রাস্তা গেছে চাঁদনী-চকের দিকে।

চক পার হয়ে ডাইনের গলিটার মধ্যে শেখ সাহেবের অম্বুরী তামাকের দোকান। বুড়ো শেখসাহেব দোকানে বসে ছিলো, মহাবীর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো—সেলাম শেখ্ সাহেব, এদিককার খবর কি?

শেখ সাহেব চোখ তুললো। কোনো কথা বললো না।

—কি খবর শেখ সাহেব?

—খবর!—এবার বুড়ো কথা বললো—সব শেষ। এ পাড়ায় তো বাড়ি বাড়ি মড়ার গাদি লেগেছিল। পচা-দুর্গন্ধ, শেষে ঠেলা গাড়িতে করে সব নিয়ে গিয়ে যমুনার তীরে পুড়িয়ে ফেলা হলো। বাড়ী বাড়ী ইরাণী ফৌজ লুঠ করেছে। পাড়াকে পাড়া শূন্য হয়ে গেছে।

—তোমার এই দোকান লুঠ হয়নি?

—আমি ছেলেটাকে নিয়ে পায়খানার নীচের ঘরে লুকিয়ে ছিলাম। তাই জান্ বেঁচে গেছে। আমি এখন একা এখানে আছি।

মহাবীর কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

শেষে জিজ্ঞাসা করে—আমার বাবা-মায়ের খবর কি?

—জানি না। সেই খুনোখুনির পর থেকে তাদের আর দেখিনি। দোকানে তামাক কিনতেও কেউ আসেনি। কারও মুখে যে খবর পাব, তেমন কেউ নেই। পুরো দু'-দিন তো লুকিয়েই ছিলাম, পরের দিনও পথে বেরোইনি। তুমি নিজে গিয়ে একবার দেখে এসো।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মহাবীর গলির মধ্যে অগ্রসর হলো।

কয়েক পা গিয়েই বুঝলো, অবস্থা কী সাংঘাতিক! কোন বাড়ীতে বাসিন্দা নেই, দরজা ভাঙ্গা, কোন কোন বাড়ীর দরজার সামনে দু'-একটা ভাঙ্গাচুরো মগ, বালতি, ছেঁড়া-বালিশ নজরে পড়ছে। সব বাড়ী লুঠ হয়েছে।

মহাবীর তখন প্রায় ছুটছে। সাত-আটখানা বাড়ি পার হয়েই সে এক ভাঙ্গা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। ভিতরে দাওয়ার উপর

চারপায়ার পাশে গড়-গড়াটা ভেঙে পড়ে আছে, কল্‌কেটা তিন টুকরো। ঘরের মধ্যে মাটির হাঁড়ি-কুড়ি একটাও আস্ত নেই। পিতলের লোটা, থালা, বাটি কিছুই নেই। ঘর দু'খানা হতশ্রী, লুণ্ঠিত। শুধু ফাঁকা ঘরে এমন কান্নাভেজা বিষণ্ণতা থাকে না।

এখানে বুঝি বাসিন্দারাও খুন হয়েছে!

মহাবীরের মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো। দাওয়ায় এসে চারপায়াটার উপর সে ঝুপ্ করে বসে পড়লো। হঠাৎ তার মনে হলো, মাথাটা যেন ঘুরছে……

* * *

সারাটা রাত মহাবীরের বাপ-মা-হারা নিঃসঙ্গ ঘরে জেগে-জেগেই কেটে গেলো। কখনো অন্ধকার দাওয়ায় পায়চারী করেছে, কখনো বা ঝুপ করে এসে বসেছে খাটিয়ার উপরে। মাথার মধ্যে কোথায় যেন আগুন জ্বলছে। বুড়ো বাপ-মাকে এভাবে হারাতে হবে, সে কোনোদিন ভাবেনি। কখনো কখনো মন তার পুড়তে থাকে, যখন ভাবে— হরবংশের কথামত ওদের সঙ্গে তখন চলে গেলেই ভাল হতো।

সকালে সে চারপায়ার উপর শুয়ে পড়লো আকাশের পানে তাকিয়ে। সন্ধ্যা অবধি কেটে গেলো সেই একই অবস্থায়। স্নানের কথা মনেও হলো না, খিদেও পেলো না। কাল থেকে পরনে সেই সরকারী পোশাকই রয়েছে।

সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ তার কি মনে হলো, চারপায়া থেকে সে উঠে পড়লো, নাগরা পায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো বাড়ী থেকে। গলি পার হয়ে চাঁদনী চক পাশ কাটিয়ে মহাবীর চললো যমুনার তীরে।

একটা নিমগাছের নীচে একটা ঝুপড়িতে শা' মুবারক থাকেন। আশী বছরের বৃদ্ধ। ফটিকের জপমালা ঘুরিয়ে চলেছেন দিনরাত। বাদশা ডুলি পাঠিয়ে দেন, আমীর-ওমরাহ্‌রা ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ায়, সেলাম দিলে মুবারক শা' আশীর্বাদ করেন, তারপর আবার মালা জপতে শুরু করেন। অনাবশ্যক কথা বলতে তিনি অভ্যস্ত নন। কেউ কোনো বিশেষ প্রশ্ন করলে সংক্ষেপে জবাব দেওয়াই মুবারক

শা'-এর অভ্যাস। নাহলে ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর কাছে বসে থাকলেও কোনো কথা নেই। তিনি চোখ বুঁজে বসে বসে মালা ঘুরিয়েই যাবেন।

মহাবীর চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইলো, তারপর বললো—হজরত সাব্, আমি একটা কথা জানতে চাই। কৃপা করে বলুন, আমার বাবা-মা বেঁচে আছেন কি না। থাকলে কোথায় আছেন ?

ফকির সাহেব চোখ মেললেন, তাকালেন মহাবীরের মুখের পানে, অন্ধকারে সে মুখে তিনি কি দেখলেন তিনিই জানেন, তারপর বললেন —নেহি হ্যায়।

মহাবীর জবাবটা শুনে নিজেকে সামলাতে কয়েক মিনিট সময় নিলে। তারপর আবার বললে—হজরত !

ফকির চোখ মেললেন।

—আমি এই মৃত্যুর প্রতিশোধ চাই।

ফকির আবার মুখের তাঁর পানে তাকিয়ে বললেন—হিম্মতের কাজ।

—আমি পারবো ?

—খোদা মেহেরবান, তিনি মেহেরবানি করলে মানুষ সব পারে।

—আমি তাহলে এখন কি করবো ?

—কেল্লাতেই থাকবে। সঙ্গে কাটাকুটির দাওয়াই রাখবে। কাউকে বিশ্বাস করবে না, খোদার উপর ভরসা রাখবে। কাজের সুবিধা করতে হলে ধর্মটাকে বদলে নাও। খোদা হাফেজ !

'খোদা হাফেজ' মুবারক শা'র শেষ কথা। এর পর যত কথাই বলা হোক, ফকির আর জবাব দেবেন না। মহাবীর সেলাম জানিয়ে উঠে পড়লো।

* * *

রাত দুপুর পার হয়ে গেছে। দেওয়ান-ই-আমের পিছনে মখমল বিছানো গদির উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে অন্তরঙ্গ মুন্শী আর আফগান ওমরাহদের নিয়ে নাদির শা' বসে আছেন। সোনার গড়গড়ার সোনালী নল মুখে রয়েছে, সরেস অম্বুরী তামাক খাচ্ছেন, আর

মুনশীর হিসাব শুনছেন। লাখ-লাখ টাকার হিসাব।

বাদশাহের দু'কোটি টাকা। তারপর দেওয়ান, উজির, সুবাদার, ওমরাহদে্র ঘর থেকে পঞ্চাশ লাখ, ত্রিশ লাখ, বিশ লাখ, পনেরো লাখ, দশ লাখ, পাঁচ লাখ। পাঁচ লাখ টাকার নীচে আর কথা নেই। তার সঙ্গে আছে হীরা-জহরৎ। বাদশাহী ময়ূ্র সিংহাসন ও কোহিনূর।

নাদির শা'-এর কাছে এ স্বপ্ন, এ আশাতীত। এ তো কল্পনার বাইরে। তইমুর লঙ্গ ও সুলতান মামুদও এত সম্পদ একসঙ্গে পায়নি।

তারপর আলমগীরের নাত্নীর মেয়েকে সে নিয়ে যাচ্ছে পুত্রবধূ করে। নাদিরের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বলে উঠলেন এ সবই খোদা-আল্লার মেহেরবানি, তইমুরের আশীর্বাদ!

নাদির তইমুরকে আদর্শ বীরপুরুষ বলে মনে করেন। তইমুরের একখানি আত্মচরিত সবসময় তাঁর হাতের কাছে থাকে। তাকিয়ার নীচে থেকে লাল চামড়ায় বাঁধানো তইমুর-চরিত বের করে নাদির সেটা পড়ার উপক্রম করলেন। মুনশীকে বললেন—ছুটি!

মুনশী বিদায় নিলো, আফগান-ওমরাহ্রাও কুর্নিশ করে বিদায় নিলো।

নাদির মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন—আবদালি!

হুঁকাবরদার পিছনে বসে তামাক সাজছিলো, সামনে এলো।

—পা দুটো একটু মালিশ করে দাও!

আবদালি নাদিরের পা টিপতে বসলো। নাদির তইমুর-চরিতের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। রাত্রি এগিয়ে চললো।

আশাতীত বিত্তলাভে উত্তেজনা আছে। নাদিরের মন উত্তেজিত হয়ে আছে। তার উপর অত্যুৎকৃষ্ট বাদশাহী সিরাজী পানীয় মাথার মধ্যে যে উত্তেজনা জাগিয়ে দিয়েছিল, তাতে ঘুম আসা সম্ভব নয়। নাদির বার বার পঠিত তইমুর লঙ্গের জীবনকথার উপর নতুন করে চোখ বোলাচ্ছেন। তইমুর তার আদর্শ। তইমুরের মত নাদিরও হবে দিগ্বিজয়ী। বাধা ছিল অর্থের, এবার সে অর্থ হাতে এসেছে। উপযুক্ত বিশাল সেনাবাহিনী রাখতে আর অসুবিধা হবে না। মধ্য এশিয়ায় এবার একছত্র অধীশ্বর হবে নাদির শা'। নাদির ঘুমুবেন কি, তাঁর

মাথার মধ্যে শিরায় শিরায় রক্ত চন্‌চন্‌ করতে থাকে।

আবদালি পা টিপতে থাকে। সারাদিনের পর রাতেও ঘুমের অবকাশ নেই, দেহে ক্লান্তি জমে, কিন্তু ক্রীতদাস তার অবসাদের কথা বলবে কার কাছে—কে শুনবে!

বেদীর উপর ময়ূর-সিংহাসন ঝলমল করছে। মাথার উপর ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় রঙের খেলা চলেছে। চুনীর লাল আভা, পান্নার সবুজ, নীলার রক্তাভ নীল, পোখরাজের হলুদ, হীরের দীপ্তি সূর্যের মত। মনে হচ্ছে যেন একটা দ্যুতিময় ময়ূর পাখনা মেলে বসে আছে। নাদির যত দেখেন তত মুগ্ধ হন। একসময় নাদির ডাকেন—আবদালি।

—খোদাবন্দ!

—ময়ূর সিংহাসনটা কেমন ঝলমল করছে!

—চমৎকার!

—ওটার দাম কত জানিস? বিশ কোটি টাকা। বাদশাহ্‌ সাজাহান তৈরি করিয়েছিলেন। তারপর এই সিংহাসনে বসেছে আলমগীর। তারপর এখন যারা বসেছে, তারা কেউ যোগ্য নয়, সিংহাসন একটা যোগ্য বাদশা চাইছে।

নাদির থামলেন। আবদালি বললো—হুজুর, এই সিংহাসনে বসার যোগ্য মানুষ একমাত্র আপনি।

—বহুত ঠিক বাতলেছো আবদালি। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। সেইজন্যই তোমাকে আমি সবসময় কাছে-কাছে রাখি। তুমি মনসবদারি করতে পারবে?

—হুজুরের হুকুম পেলে আমি সব পারি।

—আজ আমার মেজাজ বড় খুশি আছে। আজ সবাইকে বখশিস্‌ দিতে ইচ্ছে করছে। তোমাকে একটা মনসবদারি আজ আমি বখশিস্‌ দিলাম। তুমি হলে দু'-হাজারী মনসবদার।

—হুজুরের বহুত মেহেরবানি। কিন্তু হুজুর, আমি মনসবদার হলে আপনার তামাক সাজবে কে? কে আপনার হাত-পা টিপবে? এই কাজ আমার খুব ভাল লাগে।

—লড়াইয়ের সময় তুমি হবে মনসবদার, অন্য সময় তুমি যেমন আছো আমার কাছে-কাছে থাকবে।

—হুজুরের বহুৎ মেহেরবানি!

পূবের আকাশ তখন ফরসা হতে শুরু হয়েছে! একটা কাক এসে বারান্দার সীমানায় পাথরের ঝালরের উপর বসে ডাকতে শুরু করলো।

* * *

সারাদিন-রাত ঘুম নেই। আবদালি অবসন্ন হয়ে বসে আছে দেওয়ান-ই-আমের চত্বরের নীচে। একটু যে ঘুমিয়ে নেবে সে ভরসা নেই। নাদির শা' এইমাত্র একটু ঘুমিয়েছে। ঘুম ভাঙলেই তামাকের জন্য ডাক দেবেন, তখনই তামাক সেজে দিতে না পারলে অদৃষ্টে অনেক দুর্ভোগ ঘটে। আবদালি সেই দুর্ভোগ ভুগতে রাজি নয়। সে তাই চত্বরের পাশেই চুপ করে বসে আছে। কিন্তু বসে থাকলেও অবসাদের ক্লান্তিতে আবদালির চোখ বুজে আসছে।

প্রধান উজির নিজামূল-মূল্‌ক আসফ ঝা'র প্রত্যূষে ভ্রমণের অভ্যাস। ভোরে উঠে দেওয়ান-ই-আমের সামনের বাগানে তিনি পদচারণা করতে যাচ্ছিলেন, চোখ বুঁজে আবদালিকে বসে ঝিমুতে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। সূর্যোদয়ের প্রথম রশ্মির আভাসটুকু মানুষটির মুখের উপয় পড়েছে। সেই আলোয় আসফ্ ঝা ভাল করে তাকালেন আবদালির মুখের পানে।

আবদালি ঘুমুতে চায় না, জোর করে ঘুম দূর করতে মাঝে মাঝে সে তাই চমকে চমকে উঠছে। এবারও সে চমকে চোখ মেললো, সামনে নিজামূল-মূল্‌ককে দেখে কুর্নিশ জানালো।

আসফ্ ঝা মুচকি হাসলেন, বললেন—তুমি তো শাহান শা' নাদিরের হুকাবরদার।

—জী, হুজুর।

—তুমি তো আগে থেকেই আছো?

—জী, হুজুর। আমি কান্দাহারের লোক।

—দিল্লী বিজয়ের পর শাহান শা' তোমাকে কিছু বখশিস্ দেননি।

দু'-হাজারী মনসবদার করে দিয়েছেন।

—মাত্র দু'-হাজারী মনসবদারি দিয়েছেন! শাহান শা' জানেন না যে, তুমি একদিন শাহান শা'র মসনদে বসবে।

—আপনি কি বলছেন হুঁজুর!

—আমি তোমার কপালের লিখন দেখতে পাচ্ছি, পাঁচ বছর পরে তুমি হবে সুলতান, পাঁচ বছর বাদে তুমিই বসবে ময়ূর সিংহাসনে। তোমার নসীব সেই কথাই বলছে।

আবদালি ভয় পেয়ে গেল, বললো—এসব কথা বলবেন না হুজুর, তাহলে আমার কাঁধের উপর মাথা থাকবে না।

আসফ ঝা হাসলেন, বললেন—তোমার মাথা এতো সহজে যাবার নয়। তোমার ওই মাথাই তোমাকে বসাবে সিংহাসনে। মাথা যায় তো পরে যাবে, তার আগে নয়। নিজামূল-মূল্ক আসফ ঝা বাজে কথা বলে না।

আবদালি আবার কুর্নিশ করলো। আসফ ঝা এগিয়ে গেলেন বাগানের দিকে। আবদালির চোখ থেকে, ঘুম ছুটে যায়! হুকাবরদার থেকে দু'-হাজারী মনসবদার, সেখান থেকে সুলতান—এ তো আজব কথা! তা সে যত আজব ও অসম্ভব কথাই হোক, কথাটা আবদালির মনকে চেপে ধরলো। আবদালি সুলতান!

অপরাহ্ণ বেলায় আহারাদির পর নাদির দেওয়ান-ই খাসে বসে তামাকু সেবন করছেন, আর সেই সঙ্গে চলেছে নানা গল্প। সেখানে বাদশা মহম্মদ শা' বড় বড় ওমরাহরা অনেকেই আছেন। নাদির শা' দিল্লী থেকে বিদায় নেবার উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ করছেন।

কোন এক সময় নাদির কি যেন ভাবলেন, তারপর আসফ ঝাকে জিজ্ঞাসা করলেন—নিজামূল-মূলক, আজ সকালে আপনি আমার হুকা-বরদারকে কি যেন বলছিলেন? আমার ঘুম ভাঙতেই দেখি, আপনি তার সঙ্গে কথা বলছেন।

আসফ ঝা শঙ্কিত হলেন। তখন নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—হুকাবরদার সিঁড়ির উপর বসে ঝিমুচ্ছিল, তাই বললাম, খানিকটা সে

ঘুমিয়ে নিতে পারে। তা সে ভরসা পেলে না।

—কাল তাকে দু'-হাজারী মনসবদার করেছি। সে এখন ভাবছে, আমায় খুশি রাখলে আরও বড় বড় বখশিস্ মিলবে, আরও বড় হওয়া যাবে।

—বড় সে হবে শাহান শা'। তার বরাত তাকে অনেক উপরে তুলবে।

—বরাত নিয়ে আপনি তো খুব চর্চা করেন, শুনেছি। আপনি যাকে যা বলেন তার তাই ঘটে।

আসফ ঝা চুপ করে রইলেন।

নাদির শা বললেন—আমি দিল্লী দখল করবো, এ কথা আপনি কি বাদশাহ্‌কে কখনো বলেছিলেন ?

—বলেছিলাম, তিনি সর্বস্বান্ত হবেন।

—আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন ?

—কিছুটা বলা যায়,তবে সে কথা আপনার মনের মতো হবে না।

—তা হোক, আপনি বলুম।

—আপনি বেয়াদবি বলে মনে করবেন।

—কিছু মনে করবো না, আপনি বলুন।

—আপনিও লড়াই করতে করতে একদিন নিঃস্ব হবেন খোদাবন্দ, শেষ অবধি আপনার সেনাবাহিনী আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। সে বিদ্রোহ সামলানো আপনার পক্ষে সহজ হবে না।

—তারা কি আমাকে বন্দী করবে, না খুন করবে ?

—আপনি সতর্ক থাকলে রক্ষা পাবেন।

—কত দিনের মধ্যে এই বিদ্রোহ ঘটবে ?

—পাঁচ-ছ বছর।

নাদির হাসলেন, বললেন—মৃত্যুকে আমি ভয় করি না, উজির সাহেব। বহু জনের বহু মৃত্যু আমি দেখেছি, আমার মৃতুটা ঘটবে সব শেষে। সেইটাই হবে আমার শেষ দেখা। সেজন্য আমার দুর্ভাবনা নেই। আপনি নির্ভয়ে আমার মৃত্যু সম্পর্কে বলতে পারেন।

নাদির শা'কে এই ক'দিনে আসফ ঝা ভাল করেই চিনেছিলেন তাই হেসে বললেন—মানুষের সব ভবিষ্যৎ-বাণীই সফল হতে পারে, শুধু মৃত্যু সম্পর্কে কোন সময় বা ক্ষণ বলা যায় না।

—কিভাবে মৃত্যু হবে, তা বলা যায়?

—তা যায়। আপনার মৃত্যু হবে শান্তভাবে, কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে নয়।

কথাটা শুনে নাদির খুশি হলেন। বললেন—ওই হুকাবরদার কি হবে।

—ও একজন জায়গীরদার হবে।

—আমীর হবে?

—অসম্ভব নয়।

—সুলতান?

—তা-ও হতে পারে।

—আমার মত দিগ্বিজয়ী?

—সে সম্ভাবনাও আছে।

—ওই উজবুকটা যদি সত্যি একদিন দিগ্বিজয়ী হয়, তাহলে তখন সে তো আমার কথা ভুলে যাবে। ভুলে যাবে যে, সে একদিন নাদির শা'-এর একজন হুকাবরদার ছিলো!

বলতে বলতে নাদির সহসা আবদালিকে ডাকলেন—এই উজবুক ইধার আও!

আবদালি কাছে এলো।

—শির নামাও।

আবদালি মাথা নত করলো। নাদির শা হাতে আবদালির ডান কানটা ধরলেন, তার পর কোমরবন্ধ থেকে ছুরি টেনে নিয়ে কচ্ করে কানটা কেটে দিলেন। বললেন—ব্যাটা যখন দিগ্বিজয়ী হবি, তখন এই কাটা কান দেখলেই তোর মনে পড়বে যে, তুই নাদির শাহের হুকাবরদার ছিলি।

কান থেকে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। আবাদলি কাঁধের দামাস্কাসি

রুমাল দিয়ে কান চেপে ধরলো ডান হাতে, বাঁ হাতে কুর্নিশ করে বললো—আমি আপনার কেনা চাকর, আপনি আমাকে খুনও করতে পারেন হুজুর, আমি তা শাহান শা'র মেহের বানি বলে মনে করতো।

নাদির কাটা রক্তাক্ত কানটা আবদালির মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—যা তোর হুকাবরদারির ছুটি, আজ থেকে তুই হবি ছ-হাজারী মনসবদার।

—আপনি তো কাল আমায় দু'-হাজারী মনসবদার করেছেন হুজুর।

—আজ করলাম ছ'-হাজারী। যা—

আবদালি আবার কুর্নিশ করে বেরিয়ে এলো।

* * *

তোরণের মুখেই আবদালির সঙ্গে মহাবীরের দেখা। মহাবীর দেখেই চিনলো। দূর থেকে নাদিরের আশেপাশে এই মানুষটিকে এই ক'দিনে অনেকবার দেখেছে। তার মুখের উপর রুমালের পাশ দিয়ে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে দেখে, মহাবীর অবাক হলো বললো—এত রক্ত কেন সা'ব? আপনার কি হলো?

—কান কেটে গেছে! —বলে আবদালি পাশ কাটাচ্ছিলো।

মহাবীর বললো—খুব্ কেটে গেছে! চলুন, আমি আপনাকে হেকিম সাহেবের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। একটা মলম লাগিয়ে দিলেই এখনি রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

আবদালি খেয়ালে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কোথায় যাবে ঠিক নেই। মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করছে। আর মনে মনে অভিসম্পাত দিচ্ছে নাদিরকে। হেকিমের কথা শুনেই তার মন বর্তমানে ফিরে এলো, সত্যই তো কানের রক্তপাত বন্ধ করতে হবে। আবদালি ফিরে দাঁড়ালো। বললো—হেকিম সাহেব কত দূরে থাকেন?

—চাঁদনী চকে।

—মলমের দাম চাইবেন তো? আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই।

—আপনি জখম হয়েছেন, আপনার সুস্থ হওয়ার দরকার, পয়সার জন্য ভাববেন। হেকিম সাহেব যদি পয়সা চান, সে তবে আমি দোবো।

আপনি চলুন। আবদালিকে নিয়ে মহাবীর কেল্লা থেকে বেরিয়ে পড়লো।

কেল্লার দরওয়াজা সোজা চলে গেছে চাঁদ্‌নী চক অবধি। এই পথে আগে বাদশা সাজাহান জৌলুস করে বেরুতেন।

চৌমাথার উপরেই চকবাজার। চকবাজারে হেকিমী দাওয়াইখানার কয়েকটি দোকান, তারই দোতলায় হেকিম মুজিবর খানের আস্তানা। তিনিই এখানকার প্রবীণ হেকিম, কয়েকপুরুষ ধরে বাদশাহী পরিবারে ও আমীর-ওমরাহদের চিকিৎসা করে আসছেন। সেই কারণে তাঁর মর্যাদাও যথেষ্ট। মহাবীর চিনতো। সোজা সে দোতলায় উঠলো।

ঘরে ঢুকেই তার মনে হলো, ঘরের সে জৌলুস নেই। মেঝেতে দামী গালিচা নেই। দরজায় রেশমী পর্দা নেই। ঘরখানা কেমন যেন শ্রীহীন। মেঝেতে মাদুর বিছানো, তারই একপাশে একখানি ছোট আসন পেতে বৃদ্ধ হেকিম সাহেব গড়গড়া টানছেন।

—সেলাম হেকিম সাহেব!

—এসো, এসো, বসো।

—আপনার ঘরের এ কি অবস্থা হেকিম সাহেব?

আমার সব লুঠ হয়ে গেছে, আমার ছেলেটা খুন হয়েছে। আমি চাকরটাকে নিয়ে বাদশাহী মহলে ছিলাম, তাই বেঁচে গেছি। তোমার খবর ভাল? মুনশীজী ঠিক আছেন?

—আমি তো তোষাখানায় ছিলাম। বেরোনোর হুকুম ছিল না। তারপর বেরিয়ে এসে দেখি, বাবা-মা কারও পাত্তা নেই।

—সবই তকদীর, দিল্লীওয়ালাদের নসীব খারাপ! দু'-চার বছর অন্তর এক-একটা হুজ্জৎ লেগেই আছে। সবই খোদাতালার মরজি!

হেকিম সাহেব গড়গড়া খেতে ভুলে গেলেন, উদাস চোখে তাকালেন জানালা দিয়ে সামনের আকাশের পানে।

—সঙ্গে একজন রোগী ছিল হেকিম সাহেব।

—রোগী? ভিতরে নিয়ে এসো।

মহাবীর আবদালিকে ভিতরে ডাকলো।

হেকিম বললেন—কি হয়েছে দেখি ?

আবদালি হাতের রুমালটা সরালো।

—এ কি ! এতো একটা কান কেটে নিয়েছে।

আবদালি চুপ করে রইলো।

—কে এমন করলে ? কি করেছিলে ?

মহাবীর আগেই আবদালির কাছ থেকে শুনেছে ঘটনাটা। সে আবদালির পরিচয় দিল, বললো—শাহানশা' নাদির শাহে্‌র এ এক খেয়াল।

—খোদা এমন নিষ্ঠুর মানুষ সৃষ্টি করেছেন, ভাবলে মনে কষ্ট হয়। যাক্‌ তুমি বসো, আমি দাওয়াই দিচ্ছি। এখনি রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। ওসমান—ওসমান—

চাকর এলো, ঘরের একপাশে কয়েকটি তাকের উপর পাথর ও মাটির অনেকগুলি পাত্র ছিল, হেকিম তারই একটা নামিয়ে আনতে বললেন। সঙ্গে এলো সাদা কাপড়ের টুকরো। হেকিম সাহেব কাটা কানের রক্ত মুছে মলম লাগিয়ে দিলেন। বললেন—আমার ছেলেকে তোমরা খুন করেছ, আমার বাড়ী তোমরা লুঠ করেছ, তোমাদের চিকিৎসা করতে আমার ইচ্ছা হয় না। শুধু খোদাতালা তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন ভেবেই আমি তোমার চিকিৎসা করলাম। তার উপর মুনশীজীর ছেলে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

—কি দিতে হবে ?—আবদালি জিজ্ঞাসা করলো।

—তোমাদের টাকা তো লুঠের টাকা—রক্তমাখা টাকা, ও টাকা আমি নিতে পারি না।

—যদি আমি দিই, নেবেন তো ?—মহাবীর বললো।

—দেশের দুশ্‌মনের জন্য তুমি টাকা দেবে কেন ? যদি তোমার টাকা বেশি থাকে, গরীব-দুঃখীদের দাও গে। দুশমন সেবার মজুরি আমি চাইনা। যাও—

হেকিম সাহেবের মুখের পানে তাকিয়ে মহাবীর আর কোন কথা বললো না, আবদালির সঙ্গে পথে নেমে এলো।

মহাবীর বললো—এখন কেমন বুঝছেন, সাহেব? কোন কষ্ট হচ্ছে?

আবদালি বললো—সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। খুব ভাল ওষুধ।

—ইনি বাদশাহী হেকিম।

—তোমাকে খোদাতালা আশীর্বাদ করুন। তুমি যা করলে, চিরদিন আমার মনে থাকবে। যদি কখনো তোমার কোন দরকার হয় তো আমার কথা মনে রেখো—আহম্মদ আবদালি, ছ'-হাজারী মনসবদার।

—আপনি মনসবদার!

—হ্যাঁ, আগে হুঁকাবরদার ছিলাম, কান কেটে নিয়ে আজ থেকে শাহানশা' আমাকে ছ'-হাজারী মনসবদার করেছেন।

—জখম করলেন, আবার মনসবদারিও দিলেন, আশ্চর্য তো!

—শাহানশাহী খেয়াল! ওসব আমরা বুঝবো না।

* * *

আজ নাদিরের দিল্লী-ত্যাগ। সকাল থেকেই বিশাল সেনাবাহিনী অতি ব্যস্ত। সকালে আহারাদি শেষ করে প্রত্যেকে নিজ নিজ লুঠের মাল গুছিয়ে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে তৈরি হচ্ছে। এক-একটি শিবির খালি করে দিলেই খিদ্‌মতগার এসে তাঁবুর খুঁটি তুলতে শুরু করবে।

নাদির শা' সকালে দেওয়ান-ই-আমে কিছুক্ষণের জন্যে দরবারে বসেছিলেন। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। এবার কয়েকজন বিশিষ্ট ওমরাহের সঙ্গে বাদশাহের ভোজ খেতে গেছেন। এই ভোজের পরেই যাত্রা শুরু। এক লাখ মানুষের চলে যাওয়া তো সহজ ব্যাপার নয়, অল্প সময়ের কথাও নয়।

আবদালি এখনও নাদিরের কাছে-কাছেই থাকে। মাথার পাগড়ি বদলেছে, গায়ের আলখাল্লা বদলেছে; কিন্তু কোন্ দলের সে মনসবদার হয়েছে, তা এখনও জানে না। যাবার সময় হয়তো নাদির শা' বলবেন, নয়তো তা-ও বলবেন না। যেমন আছে তেমনি চলবে। তবে এখন আর তাকে গড়গড়া বইতে হয় না, এই যা কথা।

আবদালি গেল সিপাই-সর্দারদের সরাইখানায় খেতে। এখানে আর যারা আসে, তারা অনেকেই তাকে ভাল নজরে দেখে না—

হুঁকাবরদার থেকে একেবারে ছ'-হাজারী মনসবদার, একটা সাধারণ চাকর থেকে একেবারে সেনাপতি এবং ছ'-হাজারী নায়ক, এটা অনেকের কাছেই প্রীতিকর নয়। আড়ালে তারা ব্যঙ্গ করে বলে 'কানকাটা-মনসবদার'। আবদালি এ কথা জানে, তবে সে গ্রাহ্য করে না। তাকে আরও উপরে উঠতে হবে। নিজামূল-মুল্‌কের ভবিষ্যৎবাণী যদি সার্থক হয়, তাহলে আজ যারা বিদ্রূপ করছে, একদিন তারাই তাকে কুর্নিশ করবে। আবদালি সেই কারণে মুখ বুঁজে আহার করে চলে যায়, কারও সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলে না।

সরাইখানা থেকে বেরুতেই, মহাবীর তাকে সেলাম দিল—সেলাম সাহেব!

আবদালি সংক্ষেপে বললো—আজ আমরা চলে যাচ্ছি।

—জানি। কানটা কি আজ একবার হেকিম সাহেবকে দেখিয়ে যাবেন? আর তো দেখানো হবে না।

—ব্যথা-বেদনা কিছু নেই। মনে হয়, ক্ষত শুকিয়ে গেছে। আর যাবার দরকার নেই। সেদিন তুমি যা করেছিলে, তোমাকে ধন্যবাদ দিই। খোদা তোমার মঙ্গল করুন। তোমার জন্য কিছু করতে পারলে, আমি সুখী হতাম, কিন্তু সে সুযোগ আর হলো না।

মহাবীর ইতিমধ্যে মনস্থির করে ফেলেছে: যেভাবে হোক, নাদিরের কাছে-কাছে থাকতে হবে, নয়তো বদ্‌লা নেওয়া হবে না। সে বললে—আপনি এখনও আমার উপকার করতে পারেন।

—কি বল?

—আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।

—তুমি কি লড়াই জানো?

—আমি খিদ্‌মতগার হয়ে যাবো।

—তোমার দেশ ছেড়ে তুমি কাবুল-কান্দাহারে চলে যাবে, কষ্ট হবে না?

—দেশে আমার কেউ নেই, কিছু নেই। আমি আপনাদের সঙ্গে ঘুরবো, নানা দেশ দেখা হবে। কাজ করবো, কিছু মাইনেও পাবো।

বাদশাহের দরবারে কাজ করে মাইনে পাওয়া যায় না। দিনের পর দিন মুদিখানা থেকে ধার করে খেতে হয়, মুদি অপমান করে। এ অবস্থা আর সহ্য হয় না।

—বাদশা তোমাকে ছেড়ে দেবেন তো ?

—বাদশাকে কিছুই জানাবো না।

—তা তুমি যদি যেতে চাও, আমার সঙ্গে যেতে পার। তোমাকে সঙ্গে নিতে আমার কোন অসুবিধা হবে না। তোমার ঘোড়া আছে কি ?

—সে একটা ঘোড়া আমি জোগাড় করে নেবো।

—বেশ এখনি তৈরি হয়ে এসো। তা তোমার নামটা তো এখনও জানা হয়নি ? নাম কি ?

মহাবীর এই নামের ব্যাপারটা আগেই ভেবে নিয়েছিল, বললো—নাম মহম্মদ মুন্‌শী, লোকে আমাকে মুনশী সাহেব বলেই ডাকে।

—বেশ, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে এসো।

* * *

জুমা মসজিদে দ্বিপ্রহরের নামাজ সেরে নাদির শা' যাত্রা শুরু করলেন। নগরের বাইরে যে সব তাঁবু পড়েছিল, সে সবের সৈনিকেরা অনেক আগেই যাত্রা শুরু করেছিল। এবার তাদের পিছনে চললেন নাদির শা'। পর পর কয়েকটা হাতি। প্রথম হাতির পিঠে নাদির শা', পাশের হাতির উপর বাদশা মহম্মদ শা'। তারপর বাদশাহের কয়েকজন ওমরাহ্‌ নাদিরের কয়েকজন সেনানায়ক। তার পেছনে তুর্কী কাজিলবাসী ফৌজ—নাদিরের দেহরক্ষী অশ্বারোহী দল। তারপর নাদিরের খিদ্‌মতগারের দল। তার পিছনে বাদশাহী অশ্বারোহীরা।

কাজিলবাসী বাহিনীর মাঝে এক সারি ঘোড়া চলেছে যাদের পিঠে কোন সাওয়ার নেই, আছে শুধু মস্ত এক-একটি থলি বাঁধা। এই থলিগুলিতে আছে টাকা, মোহর ও হীরা-জহরত। আর হাতির সারির শেষে হাতিটার পিঠে কাপড় ঢাকা দিয়ে চলেছে ময়ূর-সিংহাসন।

বিজয়গর্বে চলেছেন নাদির শা'। বাদশা তাকে এগিয়ে দিতে

আসছেন দিল্লীর শেষ প্রান্ত অবধি। আর পাঞ্জাবের সুবাদার জাকেরিয়া খান যাবেন লাহোর হয়ে পেশোয়ার অবধি।

সবার পিছনে হাত-বাঁধা, কোমরে দড়ি-বাঁধা সারি সারি মানুষ চলেছে পদব্রজে। সঙ্গে কৃপাণধারী রক্ষী। দিল্লী শহর থেকে নাদির শা' কয়েকশত শিল্পীকে বন্দী করে নিয়ে চলেছেন। এদের নিয়ে তিনি নিজের দেশের উন্নতি করবেন। বন্দীরা কেউ স্থপতি, কেউ তক্ষণ-শিল্পী কেউ ভাস্কর, কেউ স্বর্ণকার, কেউ রৌপ্যকার, কেউ বা চিত্রকর। নাদির শা' এদের সৃজন-শক্তিকে সম্পদ বলে ধরেছেন, তাই সোনা-রূপার মত এদেরও লুঠ করে নিয়ে চলেছেন।

দামামা-বাজিয়ে দল পিছনে জয়বাদ্য বাজিয়ে চলেছে। দিগ্বিজয়ী নাদির শা' দিল্লী থেকে বিদায় হচ্ছেন। (তারিখটা ৫ই মে ১৭৩৮ অব্দ)।

* * *

দিল্লী থেকে নাদির পৌঁছলেন লাহোর। লাহোর থেকে পেশোয়ার।

পেশোয়ারের শেষে কাবুলনদীর ধারে গিরিবর্ত্মের মুখে জাকেরিয়া খান নাদিরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। জাকেরিয়া খান পাঞ্জাবের সুবাদার। দিল্লী থেকে তিনি আসছেন নাদিরের সঙ্গে। বাদশাহের ওমরাহদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মানুষ বেশি নেই।

বিদায়কালে নাদির বললেন—আমি আপনার উপর বড় সন্তুষ্ট হয়েছি খান সাহেব। বাদশাহের ওমরাহদের মধ্যে আপনি একজন যোগ্যতম মানুষ। আপনার যদি কোন প্রার্থনা থাকে তা আমায় বলুন, আমি সাধ্যমত আপনার প্রার্থনা পূরণ করবো।

জাকেরিয়া বললেন—আমি প্রজাদের কল্যাণ চাই, শাসক হিসাবে সেটাই আমার কাম্য।

নাদির বললেন—আপনার নিজের কিছু কাম্য থাকে তো বলুন, যা আমি করতে পারি।

—আমার একটা প্রার্থনা আপনি পূরণ করতে পারেন শাহানশা' কিন্তু বলতে সাহস হয় না।

—নির্ভয়ে বলুন, বিদায় বেলায় আমি আপনাকে বিমুখ করবো না।

—যেসব শিল্পীদের আপনি বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছেন তাদেরকে আপনি মুক্তি দিন, এদের আত্মীয়-পরিজনদের মুখে হাসি ফুটে উঠুক।

—এদেরকে দিয়ে যে আমি তেহেরাণ শহরকে দিল্লীর মত সুন্দর করে গড়তে চাই।

—আপনি যথাসময়ে আমাকে জানাবেন, আমি এক-একটা কাজের জন্য এক-একদল শিল্পী পাঠিয়ে দেবো, তারা এক-একটা কাজ করে ফিরে আসবে। এভাবে বন্দীর মত তারা যাবে না। স্বেচ্ছায় যাবে কাজ করতে। তাতে শাহানশা'র সুনাম ও মর্যাদা আরও বাড়বে।

নাদির কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—বেশ, সমস্ত বন্দীদের আমি মুক্তি দিলাম। আপনি ওদের নিয়ে ফিরে যান।

জাকেরিয়া কুর্নিশ করে বললেন—শাহানশা' নাদিরশা' মেহেরবান!

জাকেরিয়া খান এবার পিছিয়ে এলেন। হাতে ও কোমরে দড়ি বাঁধা কয়েকশত বন্দী পথের পাশে সরে দাঁড়ালো, কৃপাণধারী সান্ত্রীরা তাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। পিছনে জাকেরিয়া খানের যে পাঞ্জাবী রক্ষীবাহিনীর ছোট দলটি ছিল, তারা এবার বন্দীদের হাত-পায়ের বন্ধন খুলে দিলে। বন্দীরা তো অবাক।

মনসবদার জানালো—আমাদের সুবাদার জাকেরিয়া খান তোমাদের মুক্তি ভিক্ষা করে নিয়েছেন। তোমরা এবার ঘরে ফিরে যাও।

অভাবনীয় এ সংবাদে বন্দীরা হৈ-হৈ করে উঠলো। চীৎকার করে উঠলো—সুবাদার জাকেরিয়া খান সাহেবের জয় হোক!

জাকেরিয়া হাতির পিঠে ছিলেন, আকাশের পানে হাত তুলে বললেন—আমি কিছু না, সবই খোদার মেহেরবানি। আল্লা হো আকবর!

বন্দীরা সমস্বরে বলে উঠলো—আল্লা হো আকবর!

আবদালি ও মহাবীর একটু পিছিয়ে এসেছিল—ব্যাপারটা কি হয় দেখবার জন্য। সবটুকু দেখে আবদালি বললো—ভাল কাজে ভগবান সহায় হন।

মহবীর বললো—জগতে যত অন্যায় হয়, ভাল হয় তার চেয়ে কম। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, ভগবানের চেয়ে শয়তানের জোর বেশি।

—শয়তানকেও ভগবানই সৃষ্টি করেছেন। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি যা করান তাই হয়। তাঁর উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।

—তাঁর উপর বিশ্বাস নিয়েই তো আমরা বেঁচে আছি, তবু মাঝে মাঝে সে বিশ্বাস টলে যায়।

আবদালি আর কিছু বললো না। খানিকক্ষণ পরে বললো—আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি; এগিয়ে চল।

দু'জনেই ঘোড়ার রাস টেনে ধরলো। আবদালি চললো আগে, মহাবীর পিছনে।

* * *

এর পর কয়েকটা বছর কেটে গেছে। মহাবীর সিং মুনশী এখন পুরোদস্তুর মহম্মদ মুনশী। সবসময় সে আবদালির পাশে-পাশে থাকে।

শুধু যুদ্ধের সময় সে থাকে পিছনে তাঁবুতে।

এক সময় আবদালিও বলেছিল—তুমি ঘোড়ায় চড়তে জান, বন্দুক চালাতে পারো, তলোয়ার চালাতেও পারো। কাজেই লড়াইয়ে চল।

জবাবে মহম্মদ বলেছিল—ওটা আমায় বলবেন না হুজুর। মানুষকে খুন করতে গেলেই আমার হাত কাঁপে। আমি পারি না।

হেসে আবদালি বলেছিল—তুমি হিন্দুস্থানের মানুষ কিনা, তোমাদের মেজাজ বড় নরম। মেজাজ শক্ত কর, লড়াই করতে করতেই অভ্যাস হয়ে যাবে। শাহানশা' নাদির শাহের ফৌজে তুমি আছো, তুমি লড়াই করতে ভয় পাবে কেন?

মহম্মদ বলেছিল—ভয় নয়, আমি এ কাজ পারি না। তাহলে তো বাদশার ফৌজেই কাজ নিতে পারতাম। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

এর পর আবদালি আর কিছু বলেনি।

তবে এর মধ্যে যুদ্ধ বড় কম হয়নি। তেমনি চলেছে সীমাহীন

অত্যাচার। তার ফলে মধ্য এশিয়ার দিকে দিকে অসন্তোষ দেখা দেয়, অসন্তোষ অনেক জায়গায় বিদ্রোহের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। নাদিরের মতো তার কর্মচারীরা নিষ্ঠুর ছিল। তাদের অত্যাচারও অসহ্য হয়ে উঠেছিল। নাগরিকেরা সুযোগ পেলেই রাজকর্মচারীদের খুন করতো, ঘোষণা করতো—নাদিরকে আমরা রাজা বলে মানি না।

খবর যেতো নাদিরের কাছে। নাদির সৈন্য নিয়ে ছুটতেন। নগর দখল করতেন, লুঠ করে বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিতেন, বহু লোক খুন হতো।

ইস্পাহান নগরে তো নাদির নাগরিকদের বাড়ীর মধ্যে রেখেই সারা নগর জ্বালিয়ে দিলেন। খোরাসান নগরে নাদির নাগরিকদের ধরে মাথা কাটার নির্দেশ দিলেন। তারপর সেই ছিন্ন মুণ্ড দিয়ে নগরের মাঝখানে এক মিনার বানালেন। বললেন মানুষকে এমন শিক্ষা দেবো যে আমার বিরুদ্ধে আর কোন বিদ্রোহ হবে না।

তবু বিদ্রোহ হয়। হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে নাদির ছুটে বেড়ান মধ্য এশিয়ায়—ইরাণ, ইরাক, আফগানিস্থান। শান্তি নেই, স্বস্তি নেই।

এ ছাড়া আছে লড়াইয়ের খরচ। লুঠ করে যা পাওয়া যায়, খরচ হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। শেষ পর্যন্ত নাদির শা' অর্থাভাবে পড়লেন।

পয়সার যত অভাব হয় নাদিরের মেজাজ ততো নির্মম হতে থাকে। লুঠ ও জুলুমে প্রজারা বিপন্ন হয়ে ওঠে। নাদিরের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাই সর্বত্র দেখা দেয় বিক্ষোভ ও অসন্তোষ। কিন্তু প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে কেউ পেরে ওঠে না।

* * *

ইতিমধ্যে নাদির দু'বার দিল্লীর বাদশাহাকে স্মরণ করেছেন।

তইমুর লঙের বংশধর বাবর, তাঁর বংশধর দিল্লীর বাদশা, এবং নাদির দিগ্বিজয়ী তইমুরের ভক্ত, সেই কারণে বাদশা নাদিরের প্রীতির পাত্র। দিল্লী থেকে ফিরে আসার দু'বছর পরে নাদির বাদশাহের কাছে ভেট্ পাঠিয়েছেন যত বাদাম, আখরোট, কিসমিস আর তরমুজ একশো

দশটি খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে, আর তার সঙ্গে চেয়ে পাঠিয়েছেন বাদশাহের দেয় খাজনা।

বাদশা পঁচিশ লাখ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। (১৭৪০ অব্দ।)

ছ'-বছর পরে নাদির আবার বাদশার কাছে ভেট পাটিয়েছেন বাদশাহের দরবারে আমীর-ওমরাহদের জন্য একাশিটি ইরাকী ঘোড়া।

বাদশা এবার আর টাকা দিতে পারেননি, বদলে পাঠিয়েছেন যুদ্ধের জন্য একান্নটি শিক্ষিত হাতি। (১৭৪৬ অব্দ।)

এই দু'বারই নাদিরের দূতের সঙ্গে মহম্মদ মুনশী দিল্লী ঘুরে গেছে। আবদালি নাদিরের প্রিয়পাত্র, আবদালিকে বলে দিল্লী আসতে মহম্মদ মুনশীর কোন অসুবিধাই হয়নি।

এখন মহম্মদ মুনশীকে দিল্লীর বাসিন্দা মহাবীর সিং বলে চেনার উপায় নেই। এখন সে পুরোদস্তুর একজন পাঠান, মনসবদার মহম্মদ আবদালির খিদমতগার।

কিন্তু রাজপুত মহাবীর সিং বাইরে যাই হোক, অন্তরে প্রতিশোধের আকাঙ্খা তার এতটুকু হ্রাস পায়নি। সুযোগ ও কৌশলের অপেক্ষায় সে সব সময়ে সজাগ। সেই উদ্দেশ্যেই সে শাহান শা'র রক্ষীবাহিনীর কয়েকজনের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে। আগে যেটা মুখের আলাপ ছিল দু'বার দিল্লী ঘুরে এসে সেটা হয়েছে অন্তরঙ্গ 'দোস্ত'। এবং তার মাধ্যমে হয়েছে গাঁজা। দিল্লী থেকে গাঁজা আমদানি করে মহম্মদ মুনশী কয়েকজনকে গাঁজা ধরিয়ে দিয়েছে। মধ্য এশিয়ার প্রচণ্ড শীতের রাতে তাঁবুর মধ্যে যখন রাত কাটে না, থরথর করে কাঁপতে হয়, তখন এক ছিলিম গাঁজা শরীরটাকে গরম করে দেয়। এই গাঁজাকে জুগিয়ে দেয় কাজিলবাস সৈনিকেরা তাকে খাতির করে।

এই কাজিলবাসদের খাতির পাওয়া সহজ নয়। এরা অতি দুরন্ত অশ্বারোহী সৈনিক। জাতে এরা ইরাণী। মাথায় এদের লাল ফেজ থাকে, সেই জন্য সমস্ত পাগড়ীধারী আফগান সৈনিকেরা এদেরকে বলে 'কাজিলবাস' অর্থাৎ লাল মাথা। এদের দুরন্ত সাহসের জন্য শাহান শা' এদেনকে দেহরক্ষী করেছেন। দেহরক্ষী মানে তার তাঁবু-রক্ষী। শাহান

শা' যখন সেখানে গিয়ে তাঁবু ফেলেন, তারই কাছে থাকে কাজিলবাস সেনাদের তাঁবু। তার পিছনে থাকে আবদালির তাঁবু, কারণ আবদালিও শাহান শাহে্র প্রিয়জন।

* * *

কাজিলবাস সিপাহীরা বড় দাম্ভিক। আফগান বা উজবেক সিপাহীদের তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

আবদালি আফগান সর্দার, তার খিদ্‌মতগার যে মহম্মদ খান, তার সঙ্গে কাজিলবাস সর্দার মহম্মদ খান কাচার-এর পরিচয় ও খাতির হবার কথা নয়, কিন্তু হলো। এবং তো দৈবাৎ।

খোরাসান লুঠ করে যেদিন নাদির বন্দীদের মাথা কেটে নিয়ে সেই মাথা দিয়ে মিনার বানালেম, সেদিন নাদিরের মেজাজ খুব ভাল ছিল। একদিকে যারা বিদ্রোহ করেছিল তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আরেকদিকে অনেক টাকা ও জহরত হাতে এসেছে। খোস মেজাজ নাদির সন্ধ্যেবেলা দরবারে বসে এক-একজন সর্দারকে এক-একটি বখশিস্ দিলেন। কাউকে একটা হীরে, কাউকে একটা পান্না, কাউকে আবার একটা মুক্তা। কোন কোন অন্তরঙ্গ একছড়া কণ্ঠহারও পেয়ে গেল। এসবই লুঠের মাল।

আবদালিকে নাদির দিলেন একটা হীরে বসানো আংটি।

তাঁবুর বাইরে এসে আবদালি সেই আংটি দেখালো মহম্মদ মুনশীকে, বললো—তুমি তো বাদশার তোষাগারে অনেকদিন চাকরি করেছ, দেখ তো এই জিনিসটা।

মুনশী জহুরী নয়, কোনদিন হীরে-জহরৎ নিয়ে নাড়া-চাড়াও করেনি, কিন্তু তা বলে সে অজ্ঞতা প্রকাশ করলো না। পাকা জহুরীর কায়দায় আংটিটা নাড়াচাড়া করে বললো—আসলী চিজ্ হুজুর, কমল হীরে, দশ রতি হবে, দামী জিনিস। এত বড় হীরে হিন্দুস্থানের আমীর-ওমরাহের কাছেও দু-একখানার বেশি নেই।

আবদালি খুশি হলো।

তখনই কথা ছড়িয়ে পড়লো যে, আবদালি খিদ্‌মতগার হলো

দিল্লীর বাদশাহের তোষাখানার লোক, হীরে-জহরতের সমঝদার।

তাঁবু রক্ষকদের সর্দার মহম্মদ খান কাচার ছুটে এলো, বললো—দেখ তো আমার জহরতটা কেমন ?

শাহানশা' তাকে দিয়েছিল একটি চুনির আংটি।

আংটিটা হাতে নিয়ে মুনশী বললো—বাঃ! এও তো আসলী চিজ্! হিন্দুস্থানে একে বলে সূর্যমুখী চুনি। এও দশ রতি আন্দাজ হবে। এত বড় চুনি বড় একটা দেখা যায় না, টাকা দিলেও পাওয়া যায় না।

কাচার বললো—কোনটের দাম বেশি, আবদালির হীরে, না আমার এই চুনি ?

মুনশী বললো—আপনার চুনি, হুজুর।

কাচার হাসতে হাসতে আংটিটা আঙ্গুলে পরে চলে গেল। আবদালির মনে হলো, সে যেন অনেকটা ছোট হয়ে গেছে। তাঁর মুখের পানে তাকিয়েই মুনশী সেকথা বুঝলো, বললো—আপনি আমার কথা শুনে রাগ করবেন না হুজুর, কাজিলবাস সর্দার বাইরের লোক শাহানশা'র প্রিয়জন, তাকে খুশি রাখার দরকার। আপনি ঘরের লোক আপনাকে বোঝানো সহজ। আপনাকে ছোট করলাম, ওকে বড় করলাম, এতে পরে আপনারই সুবিধা হবে। আপনাকে বড় করলে ওর ঈর্ষা হতো, আপনার শত্রুতা করতো। শত্রুবৃদ্ধি করে লাভ নেই।

আবদালি বললো—তাহলে আমার হীরের দাম কম নয় ?

মুনশী বললো—হীরে সবচেয়ে দামী। কোহিনূর যে সবসেরা হীরে, সেকি লাল না সবুজ ? সে তো সাদা!

আবদালি খুশি হলো। তারপর বললো—কাজিলবাসীরা বড্ড মাথা চাড়া দিয়েছে। শাহানশা'হের রক্ষীবাহিনী হয়ে ভেবেছে ওরা সবাইকার উপরে উঠে গেছে। শাহানশা'র নজরে ওদের এই হামবড়া ভাব। এবার পতন হবে।

—পতন হবে ?

—হ্যাঁ। শাহানশা' নাদির শা' কারও হামবড়ামি পছন্দ করেন

না। গাছ বড় হলেই তিনি তার মাথা ছেঁটে দেবার ব্যবস্থা করেন।

—ওদেরকে বুঝি এবার দলে ছোট করে দেবেন ?

—কি হবে দেখতেই পাবে।

মুনশী আর প্রশ্ন করলো না। তবে একটা কোন ঘটনা ঘটবে যা আবদালির অজানা নয়, সেটা সে বুঝলো। এবং সেই ঘটনায় কাজিল-বাসদের ক্ষতি হবে। ব্যাপারটা কি জানবার কৌতূহল, প্রকাশ করা ঠিক নয় বলেই মুনশী আর কোন প্রশ্ন করলো না।

কথাটা কিন্তু মুনশী ভুললো না। ব্যাপারটা সে অন্যভাবে আবদালির মুখ থেকে বলিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। রাতে খানা খাবার সময় মুনশী বললো—কাজিলবাসদের শাহানশা' পছন্দ করেন না, কিন্তু অমন সাহসী ফৌজও তো আর নেই বলে শুনি।

আবদালি বললো—শাহানশা' অতটা বাড়াবাড়ি সইতে পারছেন না। তাই তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করতে চান।

মুনশী বললো—অন্যদলকে রক্ষী নিযুক্ত করবেন ?

—শাহানশা' নিজে আফগান, তিনি আফগানদেরই পছন্দ করেন। রক্ষী ফৌজ বোধ হয় এবার আমরাই হবো।

—তখন তো কাজিলবাসরা রেগে থাকবে আমাদের উপর। সুবিধা পেলেই আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

—যত রাগই থাকুক, সুবিধা কিছুই আর তারা করতে পারবে না। শাহান শা' যে ব্যবস্থা করেছেন, তাতে তারা এই ফৌজ ছেড়ে পালাবে।

—ভয় দেখাবেন ?

—না। একেবারে খতম !

—খতম ?

—কাজিলবাস ফৌজ শাহানশা' আর রাখবেন না। ওদের সবাইকে তাঁবুতে ডেকে পাঠাবেন দরবারে। তারপর দরবার শেষ হবার পর ওরা যখন তাঁবু থেকে বেরুবে, তখন রাতের অন্ধকারে উজবেক ও আফগান ফৌজ ওদেরকে শেষ করবে।

—ওরা অতো বিশ্বাসী, ওদেরকে শাহানশা' হত্যা করবেন ?

—ওরা বিশ্বাসী হতে পারে, কিন্তু শাহান শা' ওদেরকে বিশ্বাস করেন না। সেই জন্যই ওদেরকে মরতে হবে। দিন স্থির হয়ে গেছে, সামনের অমাবস্যার রাতে এই ঘটনা ঘটবে।

—শাহানশা' তো বড় নির্মম !

—চুপ ! একথা আর দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করো না। মানুষকে খুন করা ওঁর কাছে ছেলেখেলা। দেখলে না, আমি কত সেবা করেছি, সেজন্য কোন দয়ামায়া নেই। খেয়াল হলো, কচ্ করে আমার কানটা কেটে নিলেন। খোরাসানে নাগরিকদের মুণ্ডু কেটে নিয়ে কয়েকটা মিনার বানালেন, দেখলে না ? উনি সাধারণ মানুষের বাইরে। আমি তো অতো কাছে-কাছে ছিলাম, তবু আমি ওঁকে চিনতে পারি না।

মুনশী আর কিছু বললো না ! খানা খাওয়া শেষ করে সে গাঁজার ছিলিম সাজতে বসলো। শীতটা ক'দিন বেশি পড়েছে। এই ঠাণ্ডায় এক ছিলিম গাঁজা না টানলে শরীরটা গরম হয় না। গাঁজার কলকেটা সে আবদালির দিকে এগিয়ে দিল, আবদালিকেও সে গাঁজা ধরিয়েছে।

তারপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে মুনশী মনে মনে হিসাব করতে লাগল, অমাবস্যার আর ক'দিন বাকি।

* * *

কাজিলবাসীদের ব্যাপারটা অনেক রাত অবধি মুনশীকে ভাবিত রাখলো। রাজা-বাদশারা কি রকম সাংঘাতিক চরিত্রের মানুষ হয়, তা ভেবে স্তম্ভিত হলো। যারা বিশ্বস্তভাবে সেবা করছে, তাদেরকে অনায়াসে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে কোন দ্বিধা নেই। কৃতজ্ঞতার বালাই নেই। সহজভাবে বিদায় করে দেবার মত হৃদয় নেই। ভাল লাগে না বলে কয়েক শো মানুষকে খুন করতে হবে। এই পৃথিবীর মালিক যেন নাদির শা'। কে এই জগতে থাকবে, আর কে থাকবে না, তার ছাড়-পত্র দেবেন যেন তিনিই। এই পৃথিবী যেন তাঁর নিজস্ব ! কি সীমাহীন দর্প ! এক-একটা খেয়ালে হাজার হাজার মানুষ খুন হচ্ছে, দিল্লীতে কয়েক হাজার মানুষ খুন হলো, খোরাসানে মানুষের মুণ্ড কেটে মিনার

তৈরি হলো। আবার এই কাজিলবাসদের নিয়ে হবে আর এক হত্যা-কাণ্ডের সূচনা।

মুনশী যত ভাবে, ততো তার মাথা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই নাদির শাহের জন্য সে তার বাপ-মাকে হারিয়েছে। এই ভয়াবহ মানুষটির সংহার সূচনা করতেই তার এখানে আসা, এতদিন আবদালির দাসত্ব করা। শুধু সুযোগের প্রতীক্ষা করতে করতেই তো কয়েকটা বছর কেটে গেল। মহাবীর মুনশী শুধু ভাবতেই থাকে। রাত বেড়ে চলে।

*　　*　　*

কাজিলবাসরা শাহানশা' নাদির শা'হের রক্ষী-ফৌজ। নাদিরের তাঁবুর চারিপাশ দিয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে কাজিলবাসদের তাঁবু। কয়েক শো কাজিলবাস ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কিছু কিছু ব্যবধানে তাঁবু ফেলেছে। কোন দিক থেকেই তাদের তাঁবু পার না হয়ে নাদিরের তাঁবুতে কেউ পৌঁছাতে পারে না। এদের নায়ক মহম্মদ খান কাচার।

কাচারের বয়স হয়েছে। কিন্তু দেহের শক্তি-সামর্থ্য এখনও যুবকোচিত। অতি প্রত্যূষে তিনি ঘুম থেকে ওঠেন। উঠেই একবার ঘোড়ায় চড়ে তদারক করতে বেরোন, চারিপাশের আর সব তাঁবুর খবরদারি করেন।

আজও তিনি সকালবেলা তদারকি করে ফিরছেন, পথে মুনশীর সঙ্গে দেখা। মুনশী নত হয়ে জানালো—সেলাম।

—খোদা হাফেজ।—কাচার জবাব দিল—কেমন ঠাণ্ডা পড়েছে?

—খুব ঠাণ্ডা হুজুর, রাতে দু'বার-তিনবার ঘুম ভেঙে যায়।

—তোমার তো ঠাণ্ডার দাওয়াই আছে। এক ছিলিম টানলেই তো শরীর গরম হয়ে যাবে।

—ওইটুকু আছে বলেই বেঁচে আছি হুজুর, না হলে এই শীতে জমে যেতাম। আপনাকেও তো এনে দিয়েছি, হুজুর।

—আর চার-পাঁচ দিন পরে আমারটা শেষ হয়ে যাবে। তুমি যদি আর কিছু জোগাড় করতে পার তো আমাকে দিও।

—পাঁচ-সাত দিন পরে আপনার আর দরকার থাকবে না, হুজুর।

আপনার মুখের উপর মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। আপনি সূর্যের পানে একবার মুখ ফেরান তো, ভাল করে দেখে নিই।

কাচার পূর্ব দিকে মুখ ফেরালো। রোদ পড়লো তার মুখের উপর।

মুনশী একবার সেই মুখের পানে তাকিয়ে বললো—হ্যাঁ, যা বললাম তাই ঠিক, আপনার মুখের উপর মৃত্যুর কালো ছায়া পড়েছে।

—তুমি কি বলছো ?

—ঠিক কথাই বলছি, হুজুর। মুখের ছায়া দেখতে আমি শিখেছিলাম এক বেনারসী দরবেশের কাছে।

—তুমি যথার্থ বলছো ?

—আপনাকে মিথ্যা ভয় দেখিয়ে আমার তো কোন স্বার্থ নেই।

কাচারের মুখখানা কালো হয়ে গেল। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—আমরা ফৌজের লোক, মৃত্যুকে আমরা অত ভয় করি না।

কাচার ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। মুনশী সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

* * *

পরদিন বিকালে নাদির শা' কাজিলবাস উপনায়ক মহম্মদ খান কাচারকে ডেকে বললেন—আমার সমস্ত ফৌজের মধ্যে কাজিলবাসদের আমি বেশী বিশ্বাস করি। সেইজন্যই আমি দীর্ঘকাল এদেরকে আমার দেহরক্ষী করে ও শিবির-রক্ষী করে রেখেছি। বর্তমানে আমার মনসবদার ও সুবাদারদের মধ্যে সবাইকে যোগ্য মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। এই সম্পর্কে ঠিকমত পরামর্শ করার মানুষও আমি পাচ্ছি না। উজির, সেনাপতি যাকে যে কথা বলি, সেই কথাই বাইরে প্রচার হয়ে যায়। তোমরা চারিপাশে কতগুলি তাঁবু ফেলেছ ?

—দশটা।

—তা আমি জানি। দশটি তাঁবুতে দশজন দলপতি আছে। তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে কাল সন্ধ্যার পর তুমি আমার দরবারে এসো, কিছু জরুরী কথা আছে।

—নিশ্চয় আসবো, হুজুর।

শাহানশা' নাদির শাহ্ কাচারের সঙ্গে পরামর্শ করবেন, এ কাচারের কাছে অভাবিত। অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠলো সে। শাহানশা'র এত অনুগ্রহ সে যেন আর নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারছে না। শাহানশা'র এই রকম অনুগ্রহ পেলে, চাই কি সে একদিন নাদিরের প্রধান সেনাপতিও হয়ে উঠতে পারে। কাচার তাড়াতাড়ি চললে দলপতিদের সংবাদ দিতে।

কাচার সব ক'টি তাঁবুতে খবর দিয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে আসছে, পথের ধারে মুনশীর সঙ্গে দেখা।

—সেলাম হুজুর!

কাচার-এর মন উৎফুল্ল, বললে—কি খবর?

—আপনার নজরানা নিয়ে এসেছি, হুজুর!

—গাঁজা এনেছ?

—জী, হাঁ। আপনার হুকুম তামিল করেছি।

—এই যে কাল বললে আমার মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। গাঁজার আর দরকার হবে না।

—সেদিন যা দেখেছিলাম, তাই বলেছি, হুজুর!

—সেই ছায়া কি কেটে গেল?

—না হুজুর! আমাদের শাস্ত্রে গ্রহের প্রকোপ বাড়ে অমাবস্যা আর পূর্ণিমাতে। আপনার বিপদ সবচেয়ে গুরুতর হবে কাল, কাল অমাবস্যা। অমাবস্যা শান্তভাবে কেটে গেলে, গ্রহের প্রকোপ কমবে।

—কাল রাতে তো শাহানশা' আমাকে দরবারে ডেকেছেন, কাল তো আমার শুভদিন।

—হুজুর, কাল অমাবস্যা, কাল আপনার সবচেয়ে অশুভদিন।

—তুমি বড্ড বাজে কথা বলছো। কাল হয়তো আমি একটা ইনাম পাব।

—না হুজুর, তা হবে না, আমার গণনা মিথ্যা হবে না।

—তুমি আমাকে বাজে ভয় দেখাচ্ছ।

—না হুজুর !

—কাল যদি তোমার কথা মিথ্যা প্রমাণ হয়, তাহলে কি হবে বল ?

—আমার কথা মিথ্যা প্রমাণ করার অবকাশ কাল আপনি পাবেন না। কাল শাহানশা'র তাঁবু থেকে আপনি আর জীবিত ফিরে আসবেন না।

—মানে ?

—আপনি ঘোড়া থেকে নেমে আসুন, সব বলছি।

কৌতূহলী কাচার ঘোড়া থেকে নেমে এলো। মুনশী বললো—শাহানশা' কাজিলবাস ফৌজ আর রাখবেন না। আপনাদেরকে কাল তিনি দরবারে ডেকেছেন। সেই দরবারের মধ্যেই আফগান ও উজবেকী ফৌজ আপনাদেরকে মেরে শেষ করবে। তারপর চারপাশের তাঁবু থেকে কাজিলবাসদের মেরে তাড়াবে। আপনারা যদি বাঁচতে চান তো এখনি দলবল নিয়ে এখান থেকে চলে যান।

—তুমি ঠিক কথা বলছো ?

—কাল প্রত্যক্ষ দেখবেন। আজ রাতে আফগান ও উজবেকী সর্দারদের শাহানশা' খানা খেতে নিমন্ত্রণ করেছেন, তা জানেন ?

—জানি।

—আপনারা বাদ গেলেন কেন ?

—আমাদেরকে তো আলাদাভাবে কাল নিমন্ত্রণ করেছেন।

তাঁবুর চারপাশে তো আপনারাই পাহারাদারি করেন। আফগান ও উজবেকিরা আসার পর তাঁবুর বাইরে আপনি কান পেতে শুনবেন, ওদের কি কথা হয়, তাহলেই বুঝবেন।

কাচারের মুখখানা আবার কালো হয়ে গেল। অন্ধকারে সে মুখ মুনশী দেখতে পেল না। কাচার সর্দার আবার ঘোড়ায় উঠে বসলো, বললো—বেশ, আমি আজ খবর রাখবো। যদি তোমার কথা মিথ্যে হয় তো, আজ রাতেই তোমার মুণ্ডুপাত করবো।

আমার কথা মিথ্যে হবে না হুজুর! আমার আবদালি হুজুর তাঁবুতে ফিরে এসে শুয়ে পড়ার পর আমি গিয়ে আপনার তাঁবুতে দেখা

করবো। আপনি পাহারাদারদের বলে রাখবেন।

—ঠিক আছে।—বলে কাচার সর্দার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

* * *

রাতে আবদালি নাদির শাহে্র ভোজসভা থেকে ফিরে আসার পর মুনশী বললো—হুজুর, আজ রাতে আর গাঁজা খাবেন না। খুব ভাল ভাঙের সরবত বানিয়েছি, এক বদ্না খেলেই এক ঘুমে রাত কেটে যাবে, ঠাণ্ডা আর টের পাওয়া যাবে না। খুব সরেস সরবত বানিয়েছি।

আবদালি বললো—বেশ, দাও। আজ ভাল করে ঘুমিয়ে নিই, কাল রাতে হয়তো জাগতে হবে।

মুনশী প্রশ্ন করলো—কাল রাতে জাগবেন কেন? হুকুম করেন তো কালও সরবত বানাবো।

—না, কাল রাতে বোধ হয় একটা মারামারি বাধবে।

—লড়াই?

—তা বলতে পারো।

—কোথায় হুজুর? কাদের সঙ্গে?

—এখানেই তাঁবুর সামনে। সবই দেখতে পাবে। এখন কই তোমার সরবত দাও।

মুনশী বুঝলো, আবদালি কোন কথা বলতে চায় না। সে সরবতের বদ্না এনে আবদালির হাতে দিল।

সত্যই ভাল সিদ্ধির বাদশাহী সরবত। খেয়ে আবদালি খুশি হয়ে বললে—খুব তরিবত বানিয়েছ তো! বেশ বেশ—

আবদালি তাঁবুর একপাশে শুয়ে পড়লো।

মুনশী বাসন-কোসন হাতে নিয়ে তাঁবুর বাইরে গেল। তারপর সবকিছু সাফ্‌সুফ করে নিয়ে যখন সে ফিরলো, তখন আবদালি নাক ডাকছে। আলো নিভিয়ে মুনশী শুয়ে পড়লো।

বেশ কিছুক্ষণ মুনশী চুপ করে শুয়ে রইলো, তার চোখে ঘুম নেই। ধীরে ধীরে তাঁবুর বাইরে চারিপাশ স্তব্ধ হয়ে গেল। আবদালির পানে একবার তাকিয়ে নিয়ে একটা ঝোলা হাতে ঝুলিয়ে মুনশী বেরিয়ে পড়ল।

চতুর্দশী রাত্রির অন্ধকার। তাঁবুগুলি ঠিক নজরে আসে না। মাঝে আগুন দেখে বোঝা যায় যে, ওখানে পাহারাদার আছে। তবে কাচারের তাঁবুর নিশানা মুনশী চেনা। মুনশী সোজা এগিয়ে চললো।

কিছুটা যাবার পরেই হঠাৎ আচম্‌কা ডাক শুনলো—কৌন্ হায় রে?

মুনশী বললো—দোস্ত।

পাহারাদার এগিয়ে এলো, বললো—কৌন্ হো?

—মনসবদার আবদালি সাহেবের খিদ্‌মতগার।

—কাকে চাও?

—সর্দার কাচার সাহেবকে। আগে থেকে খবর দেওয়া আছে।

—যাও।

মুনশী এগোলো। সামনেই শিবির। দরজার পর্দা তুলে মুনশী ডাক দিল—সর্দার সা'ব!

—কে?

—আবদালির খিদ্‌মতগার।

—এসো।

ভিতরে অন্ধকার। কাচার বললো—সামনেই খাটিয়া আছে, বসো।

মুনশী দু'পা এগিয়ে খাটিয়া পেল, বসলো।

কাচার বললো—কি খবর?

মুনশী বললো—আপনি হুজুর খবর নিয়েছেন?

—পুরো খবর পায়নি, তোমার খবর কি?

—আফগান ও উজবেকদের কাল তৈরী থাকবার হুকুম হয়েছে।

—তা আমি শুনেছি।

—আপনারাও লড়াই করবার জন্য তৈরী হয়ে যাবেন।

—ওরা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, আমরা পারবো না।

—তাহলে এখান থেকে আজ রাতেই পালিয়ে যান।

—পালিয়ে গেলেও নাদির শাহে্‌র হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে

না। ভয়ে কেউ কোথাও আশ্রয় দেবে না। নাদির শাহ্ আমাদের শেষ করবেই। পালিয়ে কোন সুবিধা হবে না।

—তাহলে অন্য কোন পথ ভেবেছেন?

—ভাবছি, এখনও ঠিক করতে পারিনি।

—আপনি তাহলে ভেবে দেখুন, আমি যাই। আমি তো আবার লুকিয়ে এসেছি।

—না, তুমি একটু বসো। তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করি।

—বলুন।

—এ ক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত?

—আপনার কাছে অভয় পেলে বলতে পারি।

—বলো, কোন ভয় নেই।

—এখানে আর কেউ আছে?

—না, এ আমার তাঁবু। আমি একা থাকি।

—তাহলে শুনুন। নাদির শাহ্ থাকলে আপনাদের মরতে হবে বলেই তো আপনার ধারণা?

—হ্যাঁ।

—তাহলে নাদির শা'কে সরিয়ে দিন। নাদির শা' না থাকলে আপনারা রক্ষা পাবেন। নাদির ও কাজিলবাস—এই দু'দিক একসঙ্গে থাকতে পারে না।

—সেটা আমার মনে হয়েছে, কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব?

—অসম্ভব কেন? আপনারাই তো শাহানশা'র শিবিররক্ষী। আজ রাত্রেই আপনারা শিবির আক্রমণ করে তাঁকে শেষ করুন।

—আমরা তো আছি এখানে মাত্র সত্তর জন। পাশেই তো আফগানদের তাঁবু। কোন গোলমাল হলেই তো তারা আমাদের উপর চড়াও হবে।

—গোলমাল কিসের? শেষরাতে নিঃশব্দে কাজ সারতে হবে। ভোর হবার আগেই আপনারা এখান থেকে সরে যাবেন। নাদির শাহ্ না থাকলে তাঁর সৈন্যরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়বে। আবার একজন সুলতান

না হওয়া অবধি আপনাদের কোন ভয় থাকবে না।

—তাহলে কথাটা সকলকে জানিয়ে পরামর্শ করতে হয়।

—পরামর্শ করে তারপর তৈরী হবার সময় নেই। আপনি এদের দলপতি। আপনি নিজে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ুন, এক-একটা তাঁবুতে গিয়ে তাদেরকে তৈরী করে সঙ্গে নিন। তারপর সত্তর জন একসঙ্গে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়বেন। তাঁবুর মধ্যে সবাই ঘুমুচ্ছে, আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না।

—আমি আপনাদের জীবন রক্ষা করলাম, আর আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন? বেশ চলুন!

তখনই মহম্মদ খান কাচার পাগড়ী এঁটে তলোয়ার ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

* * *

রাত তৃতীয় প্রহর। সমগ্র প্রান্তর স্তব্ধ। অন্ধকারে সত্তর জন সশস্ত্র কাজিলবাস নাদির শাহে্র তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়ালো।

কাচার বললো—এতো জন তাঁবুর মধ্যে যাবে না। কে কে যাবে, তা আমরা এখানেই ঠিক করে নিই। কে কে আমার সঙ্গে ভিতরে যাবে, এগিয়ে এসো—

কেউ আর এগিয়ে আসে না। নাদির শা'হ্‌র তাঁবুতে ঢুকে তাকে হত্যা করা নেহাৎ সহজ ব্যাপার নয়!

মুনশী হাসলো, বললো—এরা বোধ হয় ভয় পাচ্ছে।

ঘরে আলো জ্বলছে, একজন বললো—শাহানশা' হয়তো জেগে আছেন।

মুনশী বললো—থাকুন, তিনি সাড়া তোলার আগেই আমরা তাঁকে শেষ করবো। তাঁর সঙ্গে আছে চারজন খিদ্‌মতগার। সর্বসমেত পাঁচজন। তাদেরকে ভয় করার মত কোন হেতু নেই! মোটামুটি পাঁচজন মানুষ হলেই আমাদের চলবে। তাঁবুর ভিতরে এক-একজনের জন্য এক-একজন। ওরা ঘুমুচ্ছে। ওরা জেগে উঠে সাড়া তোলার আগেই ওদেরকেও খতম করতে হবে।

এবার একে একে কয়েকজন কাজিলবাস যুবক এগিয়ে এলো কাচারের কাছে।

মুনশী অন্ধকারে তাদেরকে গুণে ফেললো। তেরো জন। বললো —এই তো অনেক, এদের দিয়েই হবে। চলুন, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।

কয়েকজন এবার গুঞ্জন তুললো—শাহনশা'র সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে আমাদের সাহস হয় না।

মুনশী বললো—শাহানশা' আর বেশিক্ষণ শাহানশা' থাকবেন না।

মুনশী সবাইকে নিয়ে সন্তর্পণে তাঁবুর মধ্যে ঢুকলো।

মস্ত তাঁবু। তাঁবুর মধ্যে শ'খানেক মানুষ দরবার করতে পারে। সমস্ত মেঝের উপর শতরঞ্চি পাতা। চারকোণে চারটি লণ্ঠন জ্বলছে। তার আলোয় তাঁবুর ভিতরটা ভাল করে দেখা যায় না। প্রথমে সকলে খানিক দাঁড়ায়ে দেখে নিল। শেষ দিকে একটা মঞ্চ। সেখানে লাল মখমলের উপর কারা যেন শুয়ে আছে। সেদিকে নজর পড়তেই কাচার বললো—এসো।

শতরঞ্চির উপর দিয়ে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে ক'জন এগিয়ে গেল।

কার্পেটের উপর শুয়ে আছেন শাহানশা' নাদির শাহ্, আর তার পায়ের কাছে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুমুচ্ছে দু'জন নফর।

কাচার এগোলো, তলোয়ার বের করে একবার ভাল করে দেখে নিলে। তারপর সেই তলোয়ার বসিয়ে দিলে নাদিরের গলায়। অত্যাচারী দিগ্বিজয়ী নাদিরের মুণ্ড দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

পরমুহূর্তেই নফর দু'জন নিহত হলো।

মুনশী বললো—আর তো ভয় করার কেউ নেই, এবার সবাইকে ডেকে আনি।

কোন কথার অপেক্ষা না রেখে মুনশী ছুটে গেল তাঁবুর বাইরে, যে সাতান্নজন বাইরে অপেক্ষা করছিল, তাদেরকে বললো—এবার ভেতরে যাও। শাহানশা'র খেলা খতম!

কাজিলবাসরা হুড়হুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়লো।

মুনশী আর ভিতরে গেল না, অন্ধকার আকাশের পানে তাকিয়ে

শুধু বল্‌লো—এতদিনে আমি মা-বাবার ঋণ শোধ করলাম। ভগবান, আমার এতদিনের সাধনা তুমি সার্থক করলে।

* * *

ভোর হয়ে এসেছে। আবদালি ঘুমুচ্ছে। মুনশী তাকে ধরে ঝাঁকানি দিল—হুজুর উঠুন!

আবদালি উঠে বসলো বটে, কিন্তু তখনও সে ঢুলছে, সিদ্ধির নেশা তখনও কাটেনি। মুনশী আবার ঝাঁকানি দিল, বললো—হুজুর, চোখে মুখে জল দিয়ে শিগগির তৈরি হোন, বিপদ দেখা দিয়েছে।

আবদালির ঢুলুনি তবু কমে না। চোখ দুটি লাল।

কলসী থেকে এক বদ্‌না জল এনে, মুনশী আবদালির মাথায় এক আঁজলা জল দিল, জল ছিটালো আবদালির চোখে মুখে।

আবদালি চেঁচিয়ে উঠলো—এই ও! খবরদার!

—উঠুন হুজুর, বড্ড বিপদ!

আবার জলের ঝাপ্‌টা।

এবার কাজ হলো। আবদালি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো, বললো—বদমাশ, বেয়াদব্‌, এখনি খুন করে ফেলবো।

—হুজুর! বড় বিপদ!

এবার দু'হাতে চোখ কচলে নিয়ে আবদালি বললো—কি হয়েছে?

—বড় বিপদ হুজুর। আগে মাথাটা ধুয়ে নিন, চোখে মুখে জল দিন, সব বলছি।

জলের বদনা নিয়ে আবদালির হাত ধরে মুনশী তাঁবুর বাইরে এলো।

মাথায় ও চোখে মুখে জল দিয়ে আবদালি ধাতস্ত হলো।

বললো—কি, হয়েছে কি?

—হুজুর, কাজিলবাসরা দল বেঁধে শাহানশা'র তাঁবুতে ঢুকেছে। এতক্ষণে শাহানশা' বোধ হয় খুন হয়ে গেছেন। এবার হয়তো ওরা আমাদের দিকে আসবে।

—শাহানশা' খুন! তুমি ঠিক জানো?

—আমার তাই মনে হচ্ছে। আপনি লোকজন নিয়ে চলুন তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।

—তুমি কি বলছো ?

আবদালি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো, তারপর বললো—তুমি এখনি আমার লোকজনকে খবর দাও, সবাই তৈরী হয়ে আসুক—একেবারে লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয়ে আসবে। যাও—

মুনশী ছুটলো সামনের তাঁবুগুলির দিকে।

আধঘণ্টার মধ্যে আবদালির দল এসে পড়লো নাদিরের শিবিরে।

ভিতরে ঢুকে তারা দেখে কাজিলবাসরা তাঁবুর সব কিছু লুঠ করছে। মঞ্চের উপর নাদির পড়ে আছে রক্তাক্ত দেহে। কি করা উচিত আবদালি প্রথমে কিছুই ঠিক করতে পারলো না। তারপর কাচারকে জিজ্ঞাসা করলো—ব্যাপার কি, সর্দার ?

কাচার বললো—শাহানশা' খতম। আমরা সব লুঠ করছি। তুমিও যা পার লুঠে নাও !

কাজিলবাসরা চীৎকার করে উঠলো—লুঠো, লুঠো !

যারা শুধুই বাড়ীঘর জ্বালিয়েছে আর লুঠ করেছে, তাদেরকে লুঠের কথা মনে করিয়ে দিলে আর অপেক্ষা করতে হয় না। আবদালির সঙ্গীরা কাজিলবাসদের সঙ্গে লুঠ করতে লেগে গেল।

বেলা এক প্রহর হতে না হতে, নাদিরের তাঁবুর মধ্যে আর কোন জিনিসই রইল না। ইতিমধ্যে সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে।

নাদিরের সেনানায়কেরা বিমূঢ় হয়ে পড়লো—এবার কার কথা শুনে তারা চলবে, কাকে বড় বলে মানবে ?

কেউ কাউকে বড় বলে মানতে চায় না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

সন্ধ্যাবেলা আবদালি সব আফগানদের ডেকে বললো—আমাদের উপরওয়ালা এখন কেউ নেই। এখন আমাদের দেশে ফিরে যাওয়াই ভাল। এখানে এবার কে বড়, কে ছোট—এই নিয়ে গোলযোগ বাঁধবে। আমরা এর মধ্যে থাকবো না।

সন্ধ্যাবেলায় আবদালি সদলে কান্দাহারের দিকে যাত্রা করলো।

তিনদিন পরে হেলমন্দ নদীর ধারে তারা এসে পড়লো।

এই তিনদিন মুনশী শুধুই ভেবেছে। যে কাজ করতে সে এসেছিল, কয়েক বছর ধরে যে প্রতিশোধের আকাঙ্খা সে অন্তরে পোষণ করে এসেছে, তা সম্পূর্ণ হয়েছে। যে নাদির শাহ্ বহুজনের নিষ্ঠুর হত্যার কারণ ঘটিয়েছে, সেই নাদির শাহ্ হত্যাকারীর হাতেই অপঘাত মৃত্যু বরণ করেছে। মুনশীর কর্তব্য শেষ। এবার তাকে ফিরতে হবে। কিন্তু কোথায় ফিরে যাবে! দিল্লীতে? সেখানে তার কে আছে? কার কাছে ফিরবে সে?

মুনশী এই সবই ভেবেছে তিনদিন ধরে। খিদ্‌মতগারের কাজ আর তার ভাল লাগছে না, এ কাজের প্রয়োজন তো ফুরিয়েছে। কেন আর সে নাম ভাঁড়িয়ে চাকরের কাজ করবে?

সন্ধ্যাবেলা নদীর ধারে আবদালি বসে আছে।

মুনশী এসে বললো—হুজুর, আমার একটা নিবেদন আছে।

—কি নিবেদন?

—যে আফগানদের নিয়ে আপনি ফিরছেন তাদের মধ্যে যোগ্য দলপতি কেউ নেই। আপনি তাদের দলপতি হোন।

—সবাই আমাকে মানবে কেন?

—আজই আপনাকে আমরা সুলতান বানাবো। আপনি কান্দাহারের সুলতান হয়ে বসুন। আমরা আজ এখানে আপনাকে সুলতান করে নিই।

কথাটা আবদালির কাছে খারাপ লাগলো না। তবু বললো—সুলতান যে হবো, সিংহাসন কই?

—সিংহাসন পরে হবে। ওই যে উঁচু ঢিবিটা আছে, ওরই উপর আপনাকে বসিয়ে আমরা অপনাকে সুলতান করবো।

—কে করবে? তুমি! সবাই হাসবে যে!

—হাসবে না। এইখানে এক ফকির আছে, সবীর মহম্মদ শা'। আমি তাকে ডেকে আনছি। আপনি তৈরী হোন।

তখনই মুনশী ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

খানিক পরে মুনশী ফকির সাহেবকে নিয়ে ফিরে এল। উঁচু একটা ঢিবির উপর বসিয়ে ফকির সবীর মহম্মদ শা' আবদালিকে আশীর্বাদ করলেন—আজ থেকে তুমি কান্দাহারের সুলতান হলে, খোদাতালার আশীর্বাদ তোমাকে বড় করুক!

মুনশী দলের সবাইকে ডেকে আনলো। বললো—আজ থেকে আমার হুজুর আহম্মদ আবদালি হলেন আহম্মদ শা' আবদালি।

* * *

পরদিন কান্দাহারে আহম্মদ শা' আবদালি সত্যই সুলতান হয়ে বসলো। মুনশী বললো—হুজুর, এবার আমায় বিদায় দিন, আমি স্বদেশে ফিরে যাই।

—তুমি এখানে থাকবে না?

—না, হুজুর। দিল্লীতে আমি ফিরে যাব।

—বেশ যাও। আমি যদি দিল্লীতে যাই, দেখা হবে।

—নিজাম-উলমুলক আসফ ঝা বলেছিলেন, আপনি একদিন শাহানশা' হবেন, তারই পত্তন হলো। যদি কোনদিন দিল্লী যান হুজুর, নাদির শাহে্র মত নরহত্যা করবেন না, এই আমার শেষ মিনতি।

—বেশ, তাই হবে।

আহম্মদ শা' আবদালি দশ বছর পরে দিল্লী এসেছিলেন দিগ্বিজয়ীর বেশে, কিন্তু তিনি তাঁর সেদিনের প্রতিশ্রুতি রাখেন নি। তিন সপ্তাহ ধরে তিনি নগর লুঠ করেছিলেন। বহু নাগরিক খুন হয়েছিল, বহু বাড়ীতে আগুন জ্বলেছিল। কোন ঘরে কাপড়জামা, টাকাপয়সা একখানা তলোয়ার কি একটা গাধা-ঘোড়া পর্যন্ত রেখে যাননি তিনি। নিয়ে গিয়েছিলেন ২৮০০০ উট, হাতি, খচ্চর আর গরুর গাড়ী বোঝাই লুঠের মাল।

নবাবজাদা

মধ্য ভারতের বৃহৎ জনপদ ভূপাল। বিশাল হ্রদ ভূপাল তলাওয়ের পাশে বিস্তৃত জনপদ। একপ্রান্তে বিশাল নবাববাড়ী, সেরেস্তা, পিছনে ফৌজের ছাউনি। হ্রদের ওপাশে পাহাড়, পাহাড়কে ঘিরে বনভূমি। হ্রদ ও পাহাড় মধ্য ভারতের এই জনপদটিকে চিত্তহারী করেছে। নবাববাড়ীর সামনে দিয়ে হ্রদের কিনারা ধরে যে প্রশস্ত পথটি জনপদের মধ্য দিয়ে উজ্জয়িনী ইন্দোর ঝাঁসীর দিকে চলে গেছে, সেই পথে একটি ছোট সুদৃশ্য বাগানওলা বাড়ীতে থাকেন দেওয়ান দীনদয়াল ঠাকুর।

নবাব মুসলমান, কিন্তু তাঁর দেওয়ান হিন্দু। হিন্দুপ্রধানদের নিয়ে রাজকাজ চালানো তখনকার নবাবী আমলে মোটেই বিরল ছিল না। মুসলমান নবাব-বাদশারা হিন্দুদের বিশ্বাস করতেন বেশি, কারণ হিন্দুরা সহজে বিশ্বাসঘাতক হয়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করতেন না। ঠাকুরগোষ্ঠীও ভূপালে তিন পুরুষ ধরে দেওয়ানী করছেন। দীনদয়াল সেই বংশের অধঃস্তন তৃতীয় পুরুষ।

দীনদয়াল এতদিন নিশ্চিন্ত মনেই দেওয়ানী করছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি দীনদয়াল ভাবনায় পড়েছেন। নবাবসাহেব এতদিন ইংরেজদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করে চলেছিলেন। প্রায় বছর খানেক হলো তিনি মারা গেছেন, নবাবজাদার বয়স কম, ইংরেজদের সঙ্গে তেমনভাবে চলতে পারছেন না। ফলে কোম্পানির রেসিডেন্ট ম্যালকম্ সাহেবের সঙ্গে নবাবজাদার বনিবনা হচ্ছে না। নবাবজাদা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন—সব ব্যাপারে ওদের অতো মুরুব্বিয়ানা আমি সইব না, আমি নবাব, আমি কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবো, কার সঙ্গে বিবাদ করবো তাতে ইংরেজের কি!

সাতসমুদ্দুর-তেরোনদী পার হয়ে এসে তারা আমার উপর মুরুলি করবে কেন! ব্যবসা করতে এসেছিস্, লাভের টাকা নিয়ে বাড়ী যা।

ইংরেজ কোম্পানী যে সারা দেশে এখন একটা প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ কথা নবাবজাদা মানতে চান না, বলেন—ওদের চেয়ে ঢের বেশি শক্তি রাখে মারাঠীরা, শিখেরা, মহীশূরের হায়দার আলি। ওদের যে কেউ একদিন ইংরেজের ঘাড় ধরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে।

কিন্তু তা কবে হবে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই; তার আগেই যে ভূপাল রাজ্য খতম হয়ে যেতে পারে নবাবজাদা এটা ভাবেন না। এইখানেই হয়েছে দীনদয়ালের দুর্ভাবনা। নবাবজাদাকে বোঝালেও তিনি বোঝেন না।

নবাবজাদার এই মনোভাব গোপন নেই—কোম্পানীর কানে কথাটা পৌঁছে গেছে। দীনদয়াল সেটা আগেই সন্দেহ করেছিলেন, আজ সেই সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়েছে। সন্ধ্যার পর ম্যালকম্‌সাহেব তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট বললেন—নবাবজাদার হালচাল গভর্নর সাহেবের নজরে এসেছে, আপনি তাঁকে সাবধান করে দেবেন।

দীনদয়াল বললেন—আমি যেটুকু জানি, কোন তো অসঙ্গতি দেখি না। তবে বয়স কম, গদিতে বসেছেন, কিছুটা মেজাজী হওয়া তো স্বাভাবিক। এই বয়সে নবাবজাদারা ওই রকমই হয়।

ম্যালকম্ সাহেব বললেন—নিজের রাজকাজে প্রজাদের উপর তিনি মেজাজ দেখান, তাতে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু কোন কোন জায়গায় গভর্নর সাহেবের সম্পর্কে তিনি যা-তা বলেছেন, এ কথা আমাদের কানে এসেছে। দরবারে বসে তিনি বলছেন, হেস্টিংস সাহেব ঠক—রাজা ও নবাবদের হুম্‌কি দিয়ে তিনি হীরে-জহরৎ আদায় করে আত্মসাৎ করেন। অযোধ্যার নবাব-বাড়ী লুঠ করে তিনি বেগমদের অনেক জহরৎ আত্মসাৎ করেছেন। গভর্নর সাহেব এ কথা শুনে মনে কষ্ট পেয়েছেন, আপনাকে সেই কথা জানাতে বলেছেন।

দীনদয়াল বললেন—আমি তো ওকথা শুনিনি, তবে আপনি যখন বলছেন, নবাবজাদাকে আমি জানিয়ে দেব।

—না, কোন কথা তাকে জানানোর দরকার নেই। আপনি তার গতিবিধির উপর নজর রাখবেন। কোনরকম বেচাল দেখলেই আমাকে জানাবেন।

—আমি থাকতে এমন কিছু ঘটবে না, যা আপনাদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। আমি নবাবজাদাকে কোন বিরোধ করতে দেব না।

—আমাদের সঙ্গে কোন বিরোধ করার শক্তি বা সামর্থ্য নবাবজাদার নেই, সে ভয় আমরা করি না। আমরা শুনেছি অন্য কথা। নবাবজাদা তাঁর সমস্ত হীরে-জহরৎ নিয়ে এখান থেকে সরে পড়ার মতলব করেছেন। আপনাকে সে-সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। তেমন কোন যোগাযোগ যদি ঘটে আমাকে জানাবেন। আমরা তখন নবাবজাদাকে সরিয়ে আপনাকে ভূপালের গদিতে বসাবো।

—এ আপনি কি বলছেন, আমি তিন পুরুষ ধরে এই নবাবের নুন খাচ্ছি।

—ও কথা ছাড়ুন। মনে রাখবেন আপনাকে দিয়ে ভূপালে একটা নতুন হিন্দু রাজ্যের পত্তন হবে। হিন্দুরা আবার বড় হয়ে উঠুক এ কি আপনি চান না?

—তা চাই, কিন্তু নেমকহারামি হবে—

—আপনি ব্রাহ্মণ, তিন পুরুষ ধরে বিধর্মীর সেবা করছেন, এর কোন গৌরব নেই। এখানে যদি আপনি হিন্দুরাজ্যের পত্তন করতে পারেন, তার গৌরব অনেক বেশি। আপনি ভেবে দেখবেন। গভর্নর সাহেবের সেই রকমই ইচ্ছা।

ম্যালকম্ সাহেব এইখানেই কথা শেষ করলেন।

দীনদয়ালের মাথায় এক নতুন চিন্তা তিনি ঢুকিয়ে দিলেন। দীনদয়াল বাড়ি এসে ভাবতে সুরু করলেন। নবাবের অধীনে দেওয়ানী করা এক কথা, আর গদিতে বসে নবাবী করা অন্য কথা! তবে একটা হিন্দুরাজ্যের পত্তন করা—একটা খুব বড় ব্যাপার! কিন্তু তার ভিত্ হবে দীনদয়ালের বিশ্বাসঘাতকতা, আর মাথার উপর মুড়ুলি করবে কোথাকার এক ইংরেজ ওই ম্যালকম্ সাহেব।

দীনদয়াল ভাবতে থাকেন। অন্ধকার ঘরের মধ্যে পায়চারি করেন। রাত বাড়ে। দীনদয়াল পনেরো বছর দেওয়ানী করছেন, কিন্তু এমন এক ভাবনায় কোনদিন তিনি পড়েন নি।

শেষ অবধি দীনদয়াল বিরক্ত হয়ে উঠলেন। যা করেন প্রভু রামচন্দ্রজী—বলে দীনদয়াল শয্যায় শুয়ে পড়লেন। ভোর থেকেই দরবারী কাজের চাপ। কাজের কথা ছাড়া তখন আর কিছু ভাববার অবকাশ নেই। দুপুরে স্নাহারের অবকাশ। তারপরেই আবার সেরেস্তায় গিয়ে বসা। ছুটি একেবারে সন্ধ্যাবেলা। তারপরেও কাজ করলে ভাল্ হয়, কিন্তু তখন আর কাজের মেজাজ থাকে না। দরবারী সেরেস্তা থেকে দীনদয়াল সোজা বাড়ী চলে আসেন। স্নান সেরে পূজোয় বসেন। রামচন্দ্রজীর পূজা করেন, জপ করেন, অনেকক্ষণ ধরেই এই পূজা-অর্চনা করেন তিনি।

পূজা শেষ করে আহার করেন। রাতে তিনি বেশি খান না, খান-চারেক পুরী, দু'টো লাড্ডু আর সেরখানেক ক্ষীর। তারপর দোতলার অলিন্দে গিয়ে বসে থাকেন অন্ধকারে। তাকিয়ে থাকেন অন্ধকার তলাওয়ের কালো জলের পানে। সেইটাই তাঁর চিন্তার সময়, রাজ্যের নানা সমস্যার সমাধান করার ভাবনা তখনই।

দীনদয়াল বিপত্নীক। স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে দশ বছর আগে। দু'টি ছেলে বেনারসে থাকে। সেখানে পণ্ডিত শঙ্করনাথের চতুষ্পাঠীতে থেকে শাস্ত্রপাঠ করে। দীনদয়াল একা থাকেন, একমাত্র ভৃত্য রাজকিশোর পাঁড়েই তাঁর সব কিছু খবরদারি করে। বাড়ীর কাজকর্ম করার জন্য আরো কিছু লোকজন আছে বটে কিন্তু আর কাউকে দীনদয়াল তেমন বিশ্বাস করেন না।

দীনদয়াল কোন উপরি উপার্জনের চেষ্টা করেন না। উচ্চ-নীচ সকলের সঙ্গে সমভাবে মেলামেশা করেন। এজন্য সরকারী মহলে তাঁকে সবাই সমীহ করে। রাজপথে কোনদিন দেহরক্ষী নিয়ে বেরোন না। যে কোন মানুষ তাঁর কাছে আসতে পারে, নিজের কথা বলতে পারে। এজন্য নাগরিকের কাছে তাঁর পরিচয়—দয়ালজী!

প্রয়োজনে মানুষ নবাবের কাছে যায় না, আগে আসে দয়ালজীর কাছে। কারও জন্য নির্দিষ্ট সময় নেই, সকাল থেকে রাত্রি অবধি অবারিতদ্বার। তবে আহারাদির পর কেউ এলে রাজকিশোর সাফ্ বলে দেয়—দেওয়ানজী শুয়ে পড়েছেন। সকালে দেখা করবেন।

এই অবকাশটুকু দীনদয়াল একান্ত নিজস্ব করে রেখেছেন।

সেদিন দেওয়ানজী নিঃসঙ্গ বসে ম্যালকম্ সাহেবের কথাটা চিন্তা করছিলেন!

ইতিমধ্যে গৃহদ্বারে ধাক্কা পড়লো। রাজকিশোর দ্বার মুক্ত করে বললো—এখন তো দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা হবে না, তিনি শুয়ে পড়েছেন।

আগন্তুকের গায়ে ছিল কালো আলখাল্লা, মাথায় বাঁধা ছিলো দামাস্কাসি রুমাল, মুখের অনেকখানিই ঢাকা পড়েছিল। আগন্তুক গম্ভীর কণ্ঠে বললো—ডেকে বলোগে নবাবজাদা সেলাম দিয়েছেন।

—নবাবজাদা! রাজকিশোর চমকে উঠলো। আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে বললো—আসুন।

রাজকিশোর নবাবজাদাকে বরাবর নিয়ে এলো দ্বিতলের অলিন্দে। দীনদয়াল বসেছিলেন, রাজকিশোর কিছু বলার আগেই নবাবজাদা বললেন—দেওয়ানজী, আমি এলাম আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা বলতে।

—নবাবজাদা!—দেওয়ানজী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। কুর্নিশ করে বললেন—আমাকে তলব করলেই তো পারতেন।

—না, ব্যাপারটা জানাজানি হয় এ আমি চাই না। ঘরে নয়, এইখানেই বসবো।

দেওয়ানজী কুরশী আনিয়ে দিলেন, নবাবজাদা বসলেন।

কয়েক মিনিট চুপচাপ কেটে গেল। তারপর নবাবজাদা বললেন—দেওয়ানজী, আপনি কাপুরুষ ধরে দেওয়ানী করছেন?

—এ তো আপমি ভাল জানেন হুজুর, তিন পুরুষ। আমার ঠাকুরদা পণ্ডিত শিবদাস ঠাকুরকে আপনার ঠাকুরদা দেওয়ানী করেছিলেন।

—সে কত বছরের কথা ?

—পঞ্চাশ বছর হলো।

—তিন পুরুষ অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর ধরে আপনি এই বংশের মিমক খাচ্ছেন।

নবাবজাদার কথার ধরন দেখে দীনদয়দাল শঙ্কিত হলেন, সবিনয়ে বললেন—হ্যাঁ, হুজুর, আপনাদের দয়ায় এখনোও বেঁচে আছি।

—আপনি হিন্দু ব্রাহ্মণ ?

—জী, হুজুর।

—আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত।

—জী, হুজুর।

—আপনি রামচন্দ্রজীর পূজা করেন, ভগবানকে বিশ্বাস করেন ?

—জী, হুজুর।

—আপনি তিন পুরুষের নিমকের সম্মান রাখবেন, এ কথা কি ধরতে পারি ?

—এ কথা কেন তুলছেন হুজুর! হুকুম করুন কি করতে হবে, আমি অবশ্যই তা করবো। আমি তো সাধ্যমত কোন কাজে কোন ত্রুটি করি না।

—কোনদিন কোন কঠিন কাজ দিয়ে তো আপনাকে যাচাই করিনি।

—কি কঠিন কাজ বলুন হুজুর, পারলে তা অবশ্যই করবো।

—না পারার কোন কথা নেই, শুধু ব্যাপারটা গোপনে করতে হবে।

—আপনি আমায় বিশ্বাস করুন।

—বিশ্বাস করি বলেই এইভাবে চুপিচুপি আপনার কাছে এসেছি।

—বলুন হুজুর, কি করতে হবে ?

—আপনি জানেন হেস্টিংস সাহেব অযোধ্যার বেগমের উপর হামলা করে তাঁদের সমস্ত হীরে-জহরৎ লুঠে নিয়েছেন। এবার তাঁর নজরে পড়েছে আরো কয়েকটি নবাববাড়ীর উপর। এখানকার নবাব-বাড়ী তার মধ্যে একটি। হেস্টিংস সাহেব যে কোন অজুহাতে, যে

কোনদিন আমাদের উপর হামলা করতে পারেন। আমাদের এখন এমন শক্তি নেই যে, তা প্রতিরোধ করতে পারি। আমাদের বাপ-ঠাকুদার সঞ্চিত অনেক হীরে-জহরৎ আছে, তার মূল্য কয়েক কোটি টাকা। সে সব ওই ভিনদেশী লুণ্ঠকদের হাতে আমি তুলে দিতে চাই না। আমি সেগুলি নিয়ে গোপনে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে চাই।

—আপনি ভূপাল ছেড়ে চলে যাবেন ? তাহলে এখানে রাজকাজ দেখবে কে হুজুর ?

—দেখবেন আপনি।

—আমার পক্ষে বড় গুরুভার হবে হুজুর।

—কিছু হবে না। আপনি ঠিক পারবেন।

—কতদিন পরে আপনি ফিরবেন হুজুর ?

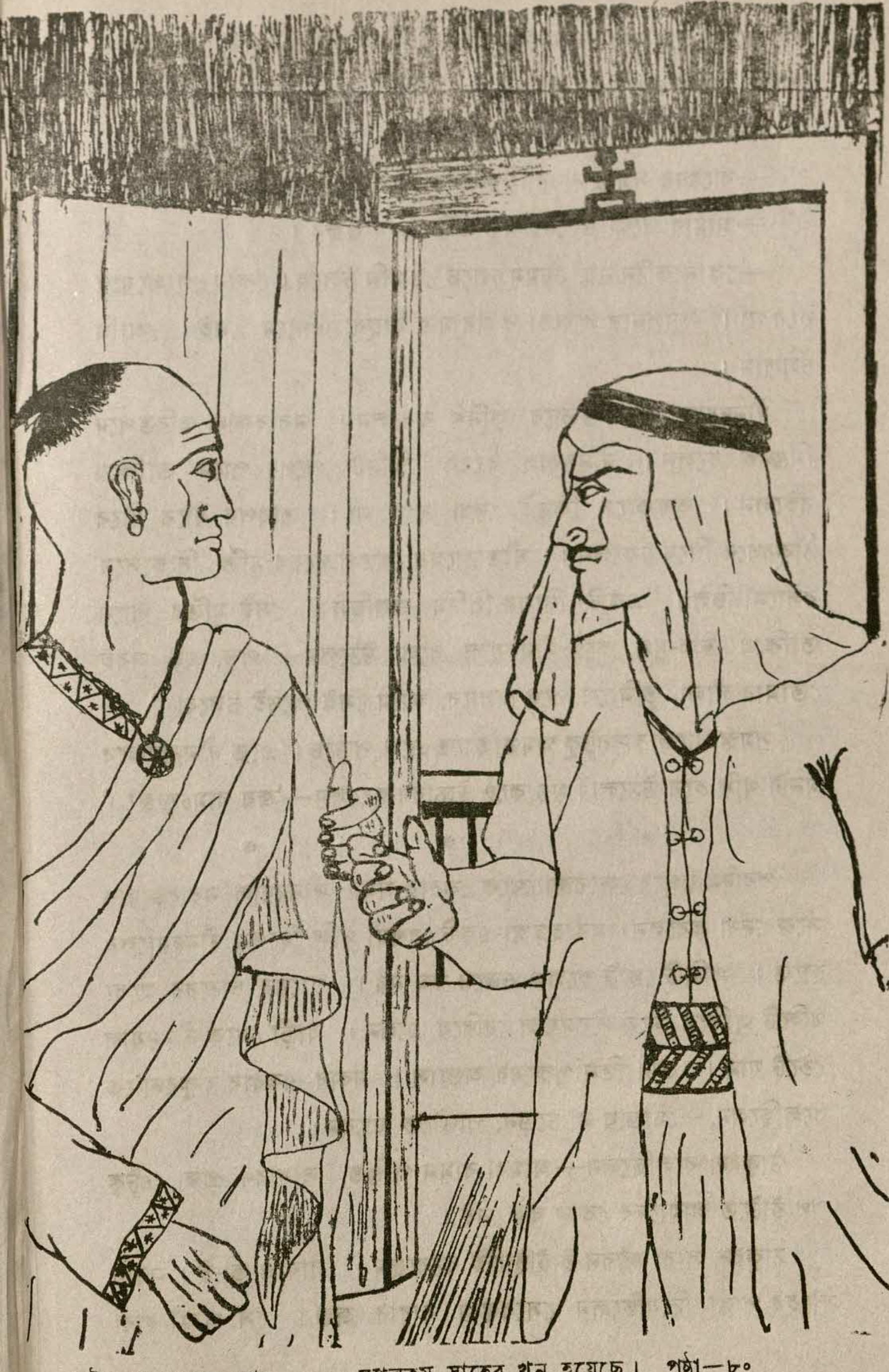
—যেদিন হিন্দুস্থানের সিপাহীরা এদেশ থেকে ইংরেজদের দূর করে দেবে।

—সে কবে হবে হুজুর ?

—হবে, শিগ্‌গির একটা বড় রকমের লড়াই হবে। মারাঠা, শিখ ও মহীশূর, ইংরেজদের এতো মুড়ুলি সইবে না। থাক সে কথা, এখন যা বলতে এসেছি শুনুন—কাল দুপুরে যখন আপনি সেরেস্তা থেকে ফিরবেন, দরবার ঘরে আমার সঙ্গে দেখা করে আসবেন। আমি আপনাকে একটি থলি দেব, জহরতের থলি, সেই থলি আপনি চাদরের ভিতরে লুকিয়ে নিয়ে বাড়ী আসবেন। সন্ধ্যাবেলাও ওইভাবে আরেক থলি জহরৎ আপনাকে দেব। এই থলি দুটি আপনি সাবধানে রাখবেন। কাল রাতে আমার খাস মজুমদার খোদাবন্দ খোজা আসবে আমার পরোয়ানা নিয়ে, আপনি ওই থলি দু'টি নিয়ে তার সঙ্গে যাবেন, তলাওয়ের পূবে পাহাড়তলির সরাইখানায় আমি থাকবো, সেখানে আমার হাতে থলি দু'টি পৌঁছে দেবেন।

—ঠিক আছে হুজুর !

—আরো শুনুন, আমি যে চলে গেছি একথা ফিরিঙ্গিরা যেন না জানে। যখন তারা নিজে থেকে খবর পাবে—পাবে। আপনি



একটা খবর জেনে যান........ম্যালকম্ সাহেব খুন হয়েছে। পৃষ্ঠা—৮০

তাদেরকে কোন কথা জানাবেন না। যদি জিজ্ঞাসা করে, বলবেন—'আমি কিছুই জানি না।'

ঠিক আছে, হুজুর।

—রাজ্যের সমস্ত দায়দায়িত্ব এখন আপনার হাতেই রইল।

—আমার পক্ষে ওইটেই বড় কঠিন হবে হুজুর।

—কোন কঠিন নয়, যেমন চলছে তেমনি চলবে। কোন গোলযোগ হবে না। আপনার শক্রতা করার মত মানুষ এখানে নেই। আমি চললাম।

দীনদয়াল শশব্যস্তভাবে কুর্নিশ করলেন। নবাবজাদা ত্বরিতপদে নিষ্ক্রান্ত হলেন। দীনদয়াল কয়েক মিনিট পথের পানে তাকিয়ে রইলেন। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তারপর ধীরে ধীরে ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সীতারামের শ্বেতপাথরের মূর্তি সিংহাসনে বসানো ছিল। একটি ঘিয়ের পিদিম জ্বলছিল। সেই মূর্তির পানে তাকিয়ে ভাব-মুগ্ধ কণ্ঠে দীনদয়াল বলে উঠলেন—'প্রভু, এই সবই তোমার লীলা, তুমি যে পথে চালাবে, আমি সেই পথেই চলবো!'

সমস্ত রাজ্যের সবটুকু ক্ষমতা হাতে এসে পড়ছে। এতে দীনদয়ালের মনটা খুশি হয়ে উঠলো। মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—'জয় রামচন্দ্রজী!'

* * *

পরদিন দুপুরে সেরেস্তা থেকে ফেরার সময় দীনদয়াল নবাবজাদার সঙ্গে দেখা করলেন। নবাবজাদা একটি রেশমী থলি দিলেন দীনদয়ালের হাতে। থলিটি ছোট হলেও ওজনে কম নয়। গায়ের চাদরের মধ্যে থলিটি লুকিয়ে নিয়ে দীনদয়াল বেরিয়ে এলেন। বাড়ী থেকে দীনদয়াল হেঁটে যান। এটা তিন পুরুষের অভ্যাস। নবাব একবার ঠাকুরদা'কে বলেছিলেন,—ঘোড়ায় না চড়েন, পাল্কীতে যাবেন।

ঠাকুরদা বলেছিলেন—আমরা বামুন পণ্ডিত, সাধারণ প্রজা, এটুকু পথ হাঁটতে আমাদের কোন কষ্ট নেই।

ঠাকুরদা সারা জীবন হাঁটাহাঁটিই করেছেন। বাবাও তা-ই। নবাব সাহেব পাল্কী দিয়েছিলেন সেরেস্তায় যাবার জন্য। সে পাল্কী বাবা

কখনও চড়েন নি। বলতেন—হাঁটলে শরীরে মজবুত থাকে।

দীনদয়ালও সেই ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এতদিন এই পথটুকু আসতে কোন কষ্ট ছিল না। কিন্তু আজ এই জহরতের থলির ভারটা বেজায় কষ্টবহ বলে মনে হলো। যাক্, বাড়ী এসে থলিটাকে সিন্দুকে তুলে রেখে দীনদয়াল সুস্থির হলেন। সন্ধ্যাবেলাতেও ওই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো।

নবাবজাদা শুধু স্মরণ করিয়ে দিলেন—রাত প্রথম প্রহরে প্রস্তুত থাকবেন।

* * *

রাত্রি প্রথম প্রহরের অনেক আগেই দীনদয়াল পূজাহ্নিক শেষ করে, আহারাদি সেরে প্রস্তুত হলেন।

ইতিমধ্যে রাজকিশোরকে দিয়ে দুপুরে ম্যালকম্ সাহেবের কাছে তিনি খবর পাঠিয়েছেন, সাহেব যেন রাত দ্বিতীয় প্রহরে পাহাড়তলির সরাইখানার কাছে সিপাই নিয়ে হাজির থাকেন। জরুরী ব্যাপার।

জহরৎসুদ্ধ নবাবজাদা যদি ম্যালকমের হাতে ধরা পড়েন, তাহলে দীনদয়াল ইংরেজকে পরম সহায় হিসেবে পাবেন। ইংরেজ সহায় থাকলে দীনদয়াল অল্প সময়ের মধ্যে গুছিয়ে নেবেন! তারপর যদি সত্যই সংগ্রাম বাঁধে, তখন বিচার করে মারাঠা বা ইংরেজের পক্ষ নিলেই চলবে। তিনিই এখানে হিন্দুরাজ্যের পত্তন করবেন। এটাই বোধহয় শ্রীরামচন্দ্রজীর ইচ্ছা!

দীনদয়াল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন, এমন সময় জানলায় কার ছায়া পড়লো। মৃদু কণ্ঠে শোনা গেল—ঠাকুর সাহেব!

—কে?—দীনদয়াল সচকিত হলেন।

—দরজাটা একবার খুলুন।

—কে আপনি?

—বেগমসাহেবার বাঁদী।

দীনদয়াল তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলেন। বাঁদী ঘরে ঢুকলো। দীনদয়াল দরজা বন্ধ করে বললেন—দাঁড়াও, আলো জ্বালি।

বাঁদী ত্রস্ত স্বরে বললো—না, না, আলো জ্বালবেন না। বাইরের লোকের নজরে পড়বে। আমি গোপনে এসেছি, গোপনে চলে যাবো।

দীনদয়াল বললো—বল, কি দরকার।

—শুনুন! আম্মা বেগম সাহেবা, নবাবজাদার মা, আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। নবাবজাদা ক'দিন ধরে মায়ের উপর জুলুম করছেন। তাঁর যত হীরে-জহরৎ আম্মা বেগমের কাছে আছে, সে সব নবাবজাদা চেয়েছেন, না হলে বলেছেন বিষ খাইয়ে হত্যা করবেন। আম্মা বেগম তাই রাজবাড়ী থেকে চলে যেতে চান। আপনি তাঁকে সাহায্য করুন।

—কোথায় যাবেন, কিছু ঠিক করেছেন?

—ইংরেজ রেসিডেন্সিতে আশ্রয় নেবেন।

—কিন্তু নবাবজাদা যখন একথা শুনবেন, তখন তো আর আমার ঘাড়ে মাথা থাকবে না।

—কথাটা গোপন থাকবে।

—আম্মা বেগম বাড়ি ছেড়ে যাবেন, কেউ জানবে না?

—মাঝরাতে একজন মাত্র বাঁদী নিয়ে তিনি চলে আসবেন। আপনি তাঁকে রেসিডেন্সিতে পৌঁছে দেবেন। আজ রাত্রেই তিনি আসবেন, আপনি ব্যবস্থা করুন।

—আজ রাত্রেই?

—হ্যাঁ, আজই।

দীনদয়াল খানিক চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—এইভাবে ইংরেজ রেসিডেন্সিতে যাওয়াটা কিন্তু আমি মর্যাদাহানি বলে মনে করি। তাছাড়া ফিরিঙ্গিদের আমি বিশ্বাস করি না। ওঁরা হীরা-জহরৎ-গুলো কেড়ে নিয়ে ওঁকে হয়তো কলিকাতায় পাঠিয়ে দেবে।

—তাহলে আপনি কি বলেন?

—উনি আমেদাবাদে ভাইয়ের কাছে চলে যান। সেই ব্যবস্থাই ভাল হবে।

—কিন্তু নবাবজাদার চোখের সামনে দিয়ে তো যাওয়া যাবে না।

তাহলে তো আম্মা বেগমকে খালি হাতে চলে যেতে হবে। নিজের গহনাপত্তর নিয়ে যেতে হলে তাঁকে লুকিয়ে যেতে হবে।

—লুকিয়েই যাবেন। আমি ওঁকে ভরতপুরের চটি অবধি পৌঁছে দেব। সেখান থেকে ওঁর সঙ্গে কয়েকজন সিপাই দিয়ে দেব। তারা ওঁকে পৌঁছে দেবে।

—এ তো অতি উত্তম ব্যবস্থা, আমি আম্মা বেগমকে সেই কথাই বলবো। রাত্রে কোন সময় আপনার সুবিধা হবে বলুন ?

দীনদয়াল মনে মনে একটু হিসাব করে নিলেন। তারপর বললেন —রাত তৃতীয় প্রহর হলেই ভাল হয়।

—বেশ, যথাসময় আমরা আসবো। বাঁদী বিদায় হলো।

দীনদয়ালের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিলো। নবাবজাদা পালাচ্ছেন রাত্রির প্রথম প্রহরে, তাঁর মা আম্মা বেগম পালাচ্ছেন রাত্রির তৃতীয় প্রহরে। রাত্রি শেষে নবাববাড়ীতে এমন কেউ থাকবেন না, যিনি দীনদয়ালকে হুকুম করতে পারেন। এ বুঝি দীনদয়ালের পরম শুভরাত্রি।

* * *

রাত প্রথম প্রহরের শেয়ালের ডাক শেষ হলো। পরক্ষণেই জানালায় মানুষের ছায়া পড়লো। ডাক শোনা গেল—দেওয়ানজী !

—কে ?

—আমি খোদাবন্দ খোজা।

—ঘুরে খিড়কির দরজায় যান, আমি আসছি।

কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে, সিন্দুক থেকে থলি দু'টি বের করে নিয়ে দীনদয়াল পেছনের প্রাঙ্গণে এলেন। একটা গাছে একটা কালো ঘোড়া বাঁধা ছিল, তার জিনের দু'পাশে থলি দুটি ঝুলিয়ে নিয়ে দীনদয়াল খিড়কির দরজা দিয়ে পথে বেরুলেন। খোদাবন্দ ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। দু'টি ঘোড়া পাশাপাশি ছুটলো তলাওয়ের পাশ দিয়ে দক্ষিণ মুখো। নির্জন পথের অন্ধকারে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। নবাববাড়ী পার হলেই ফৌজী ময়দান। কিছুক্ষণ আগে অবধি এখানে দশহাজারী মনসবদারের তাঁবু পড়তো। ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে

সন্ধি হবার পর থেকে এ ময়দানে আর ফৌজ থাকে না। অন্ধকার জমাট বেঁধেছে তেপান্তরের মাঠে। সেই মাঠের শেষ থেকে বনভূমি। কিছুটা গেলেই পাহাড়ের চড়াই স্নুরু হয়েছে। চড়াইয়ের মুখেই দু'-চার ঘর কাঠুরিয়ার বাস। তাদের কাঁচা মাটির ঘরের এক পাশে পাকা একখানি ঘর ও প্রাঙ্গণ নিয়ে আবদুল্লা শেখের মুসাফিরখানা। মুসাফিরখানার ফটকের মাথায় একটা লণ্ঠন জ্বলছিল। তবে ফটক বন্ধ। দীনদয়াল সঙ্গীর সঙ্গে ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওদিকের গাছতলা থেকে এক ঘোড়সওয়ার এগিয়ে এলো। কালো ঘোড়া, সওয়ারের সর্বাঙ্গ কালো আলখাল্লায় ঢাকা। সওয়ার কাছে এসে বললো—সেলাম দেওয়ানজী।

দেওয়ানজী তাড়াতাড়ি কুর্নিশ করে বললেন—সেলাম হুজুর !

কালো সওয়ার বললো—থলি দু'টি দিন।

দীনদয়াল জীন থেকে দুটি থলির বন্ধন খুলে নবাবজাদার হাতে তুলে দিলেন। কালো সওয়ার বললো—এবার আপনি যেতে পারেন।

দীনদয়াল বললেন—কবে আবার আপনার দেখা পাব হুজুর ?

—এখন কিছু ঠিক নেই।

—আপনার মা যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন কি বলবো ?

—বলবেন, কিছু জানি না।

কালো সওয়ার ঘোড়ার দিকে মুখ ফেরালো। সঙ্গী দু'জন এগিয়ে গেল তাঁর কাছে। 'সেলাম হুজুর, খোদা হাফিজ'—বলে কুর্নিশ জানিয়ে দীনদয়ালও ঘোড়ার মুখ ফেরালেন।

এবার দীনদয়াল একা। ধীর কদমে তিনি ফিরলেন।

ফৌজী ময়দানের কিনারায় বড় বটগাছটার নীচে এসে দীনদয়াল থামলেন। অন্ধকারে চারিপাশ ভাল করে ঠাহর করে নেবার চেষ্টা করলেন, তারপর উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন 'জয় রামচন্দ্রজী'!

সে স্বর অন্ধকারে হারিয়ে গেল। দীনদয়াল আবার ধীর কদমে অগ্রসর হলেন। এবার যেন তিনি দূরে ঘোড়ার পদশব্দ শুনতে পেলেন। সরে দাঁড়ালেন পথের একপাশে।

সত্যই কয়েকজন ঘোড়সওয়ার এসে পড়লো। তারা সামনা-সামনি আসতেই দীনদয়াল আবার হাঁক দিলেন 'জয় রামচন্দ্রজী'!

সে হাঁক শুনেই সাড়া উঠলো—'হলট্!' ঘোড়সওয়ার থামলো। নায়ক এগিয়ে এলো দীনদয়ালের দিকে, বললো-দেওয়ানজী!

দীনদয়াল সাড়া দিলো—জী হ্যাঁ।

—সব ঠিক আছে?

—জী, হ্যাঁ। আপনারা দেরি করে ফেলেছেন।

—না দেরি করিনি, আমরা ঘড়ি ধরে বেরিয়েছি। ওরা ক'জন?

—তিনজন।

—অল রাইট্, গুড নাইট্। কাল আমার সঙ্গে দেখা করবেন।—বলে ম্যালকম্ সাহেব সঙ্গীদের আদেশ দিলেন—'কাম্ অন্!'

ম্যালকম্ অশ্বারোহীদের নিয়ে ছুটলেন আবদুল্লার সরাইখানার দিকে। দীনদয়ালও এবার ঘোড়া ছোটালেন পূর্ণবেগে।

* * *

দেওয়ানজী খিড়কি দিয়েই গৃহে প্রবেশ করলেন।

ঘোড়াটি প্রাঙ্গণে ছেড়ে দিয়ে তিনি ঘরে এসে বসলেন।

আজ রাত্রে তাঁর ঘুমুবার অবকাশ নেই, আজ তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় পরিবর্তনের রাত। ঘটনাবহুল স্মরণীয় রাত। কাল সকাল থেকে দীনদয়াল ঠাকুর হবেন ভূপাল রাজ্যের সর্বেসর্বা। আজ রাত্রি শুধু তার উপক্রমাণিকা। একটা রাত্রির সামান্য একটু ঘোরা-ফেরায় রামচন্দ্রজী তাঁর বরাত ফিরিয়ে দিচ্ছেন। না হলে এতবড় একটা রাজ্য দখল করতে হলে কত রক্তপাত হয়, কত গোলযোগ হয়, কত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সবই শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা!

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের শেয়ালের ডাক উঠলো।

ঠিক সেই সময় একটি ছায়া দেখা গেল দেওয়ানজীর জানালায়, মৃদুকণ্ঠে আগন্তুক ডাকলো—দেওয়ানজী, জেগে আছেন।

দেওয়ানজী দরজা খুলে দিলেন।

বোরখা ঢাকা বাঁদী বললো—বেগমসাহেবা এসেছেন।

দীনদয়াল বললেন—ভিতরে আসুন।

—তিনি ভিতরে আসবেন না। বাইরে অপেক্ষা করছেন, আপনি সত্বর প্রস্তুত হয়ে নিন।

—আমি তৈরি হয়ে বসে আছি—

দীনদয়াল কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। প্রাঙ্গণে নেমে বললেন—বেগমসাহেবা যাবেন কিসে, তাঞ্জামে ?

—না, উনি ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন, তাঞ্জামে যেতে গেলে জানাজানি যাবে।

—তুমি ?

—আমিও ঘোড়া এনেছি।

বাগানে ঘোড়া বাঁধা ছিল, তার রাশ ধরে দীনদয়াল বাইরে এলেন। পথের অন্ধকারে একটি টাট্টু ঘোড়ার উপর বেগমসাহেবা অপেক্ষা করছিলেন। কালো বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢাকা। দীনদয়াল আভূমি কুর্নিশ জানালেন—সেলাম মালেকান !

বেগমসাহেবা মাথাটা একটু দোলালেন মাত্র।

পাশে আরেকটি টাট্টু দাঁড়িয়েছিল, বাঁদী তার উপর উঠে বসলো। দীনদয়ালও এবার নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। তারপর বললেন—কোথায় যাবার আজ্ঞা হয় ?

বাঁদী বললো—গোবিন্দপুরের চটি। সেখানে আমাদের সব ব্যবস্থা আছে।

দীনদয়াল তলাওয়ের উত্তর দিক ধরে ধীরে কদমে অগ্রসর হলেন। পিছনে বোরখা-পরা আর দুই সওয়ার।

* * *

নগরের মধ্যে দিয়ে তাঁরা এগিয়ে চললেন। মধ্যরাত্রির ঘুমন্ত, স্তব্ধ নগরী। আলোহীন নির্জন জনপথ। তাঁদেরই ঘোড়ার পদশব্দ ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই। ক্রোশব্যাপী বিস্তৃত নগর শেষ হলো। এবার সোজা পথ ইন্দোর হয়ে আগ্রার দিকে চলে গেছে।

পথের দু'পাশে আর বসতি নেই। আছে ক্ষেত-খামার। আরো

ক্রোশখানেক গেলে আছে পাহারাদার চৌকি। তার পাশে গোবিন্দ-পুরের চটি। আর একটু গেলেই গোবিন্দপুর গাঁও।

পাহারদারী চৌকিতে একটা আলো জ্বলছিল। বাইরে কোন সিপাই ছিল না। কিন্তু পাহারা তো থাকার কথা, দেওয়ানজী দেখে মনে মনে বিরক্ত হলেন। কিন্তু তাঁকে দেখার যে কেউ নেই, এজন্য স্বস্তিও পেলেন। এবার তাঁরা এসে পড়লেন চটিতে। রাত তৃতীয় প্রহর শেষ হয়েছে।

এই সময় চটি ঘুমন্ত থাকবে—এই কথাই দেওয়ানজী ভেবেছিলেন। কিন্তু সামনে এসে দেখলেন, প্রাঙ্গণে অনেকগুলো লোক বসে আছে। তাঁদেরকে দেখতে পেয়ে কয়েকজন এগিয়ে এলো। দেওয়ানজীর তখন আর পিছিয়ে যাবার উপায় নেই। বাঁদীর পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এরা কি বেগমসাহেবার লোক ?

বাঁদী বললো—হ্যাঁ, এরা সবাই নবাবী সিপাই। ফৌজদার খোদাবক্স এখানে হাজির আছেন।

দেওয়ানজী ঘোড়া থেকে নামলেন।

বাঁদী আগেই নেমেছিল, বেগমসাহেবা এবার নামলেন।

জমকালো পাগড়ী মাথায় একটি সিপাই এসে সামনে দাঁড়ালো, বললো—সেলাম দেওয়ানজী, ভিতরে আসুন, তসরীফ্ রাখুন !

দীনদয়াল বললেন—সেলাম খোদাবক্স সাহেব, আমি তো এখানে অপেক্ষা করতে পারবো না। বেগমসাহেবাকে আপনার কাছে জমা করে দিয়ে আমি ভোরের আগেই সবার অলক্ষ্যে ফিরে যেতে চাই। ব্যাপারটা যেন জানাজানি না হয়।

—আপনার আর ফিরে যাবার দরকার হবে না দেওয়ানজী—বলে বেগমসাহেবা সামনে এসে দাঁড়ালেন। বোরখা খুলে ফেললেন—দেখা গেল তিনি বেগমসাহেবা নন, স্বয়ং নবাবজাদা।

দেওয়ানজী এমন হতবাক্ হলেন যে কুর্নিশ করতেও ভুলে গেলেন।

নবাবজাদা বললেন—দেওয়ানজী, আপনি তিন পুরুষ দেওয়ানী করছেন, সেই কথা ভেবেই আমি আপনার মাথাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে

দেবার হুকুম দিলাম না। আপনি নবাবের নিমকের মর্যাদা রাখেন নি। ইংরেজদের সঙ্গে আপনি গোপনে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। নবাববাড়ীর হীরে-জহরৎ লুঠ করার জন্য এবং আমাকে তাড়িয়ে গদি দখল করার জন্য। আপনার এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেছে। আমি আপনাকে এই রাজ্য ছেড়ে এখনি চলে যাবার আদেশ দিচ্ছি, আর কোনদিন যদি ভূপালে আপনাকে দেখা যায়, এই দণ্ডেই আপনাকে হত্যা করা হবে।

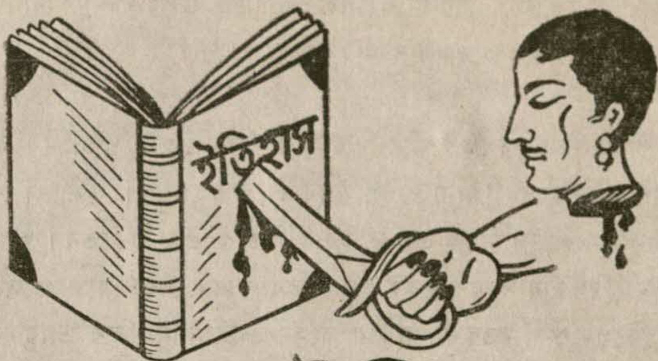
দীনদয়াল কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, নবাবজাদা বললেন—আর কোনো কথা নয়, আপনি নিমকহারাম, আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যান।

দীনদয়াল তবু ইতস্ততঃ করছিলেন, নবাবজাদা গভীর স্বরে ডাকলেন—ফৌজদার!

—হুজুর!—খোদাবক্স এগিয়ে এলো।

দীনদয়াল বুঝলেন, আর কোন কথা চলবে না। ঘোড়ার পিঠে চড়ে, একটা কুর্নিশ করে অন্ধকারে তিনি ঘোড়া ছোটালেন। যাবার মুখে নবাবজাদা শুধু বললেন—একটা খবর জেনে যান। একটু আগে ম্যালকম্ সাহেব আমার সিপাইদের সঙ্গে লড়াই করে পাহাড়তলিতে খুন হয়েছেন।

দীনদয়ালের ঘোড়া তখন ছুটতে শুরু করেছে।



রক্তাক্ত ইতিহাস

রাজ্যলাভ ও রাজ্যরক্ষার জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। পুরানো দিনের এই সব ঘটনাকে এখনকার লোকে বলে যে, 'সেকেলে এমন ঘটনা সম্ভব হয়েছিল, তার কারণ মানুষ তখনকার দিনে এখনকার মত ভাবনায় অগ্রগামী ছিল না।' কিন্তু সত্যি কি তাই? এই কয়েক বছর আগে এরোপ্লেন ও রেডিওর যুগে জার্মানির হিটলার জার্মান সংস্কৃতি রক্ষা করার নামে হাজার হাজার ইহুদীকে বেপরোয়া ভাবে হত্যা করলো। তারপর এই সেদিন কঙ্গোতে পেট্রিক লুবুম্বার মত নামকরা দেশনেতাকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করে তার মৃতদেহটা অবধি এসিডে গলিয়ে ফেলা হলো। প্রেসিডেন্ট কেনেডি সাহেবকে গুলি করে মারা হলো পৃথিবীর সবসেরা সভ্যতাগর্বী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এই সব দেখেশুনে কি মনে হয়, মানুষের চিন্তাধারার সত্যিই কিছু অগ্রগামী হয়েছে!

আমাদের দেশে রাজ্যের লোভে খুনোখুনি অনেক হয়েছে। বিশাল দেশ, স্বাধীন রাজ্যও অনেক। পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা এসব ঘটেছে অসংখ্য। মগধের অজাতশত্রু পিতা বিম্বিসারকে কারারুদ্ধ করে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। সম্রাট অশোক বড় ভাইকে যুদ্ধে নিহত করে রাজ্য অধিকার করেছিলেন। বার বার এই ধরণের ঘটনার

পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। প্রাচীন কালের সব রাজ্যের সব ঘটনা জানা যায় না, তবে মধ্যযুগের কয়েকটি ঘটনা ইতিহাসের পাতায় আছে।

গিয়াসুদ্দিন তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে বসেন ১৩২০ খৃস্টাব্দে। তাঁর অনেকগুলি ছেলে। জুনা খাঁ বা উলুঘ খাঁ, বড় ছেলে। জুনা খাঁ শেখ নিজামুদ্দিন আউল নামক এক ফকিরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। আলা-উদ্দিন খিলজীর সময় থেকেই এই ফকির সাহেব সর্বজনমান্য ছিলেন। ইনি ছিলেন সুফী মতবাদী, সুফীরা বলেন—ভালবাসা দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায়, ভগবানকে ভালবাসতে হলে মানুষকেও ভালবাসতে হয়।

গিয়াসুদ্দিন এই মানুষটিকে পছন্দ করতেন না। এই নিয়েই বড়-ছেলের সঙ্গে তাঁর মতান্তর দেখা দেয়। আউলিয়া এসব বিরোধ পছন্দ করতেন না। নগরের বাইরে তিনি অতি সাধারভাবে বাস করতেন। টাকা-কড়ি যা পেতেন, সবই তিনি খয়রাতি করে দিতেন গরীব-দুঃখীদের। এই ফকিরকে ছেলে অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করে দেখে সুলতান অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করতেন।

ইতিমধ্যে বাংলার সুলতানের সঙ্গে বিরোধ বাঁধলো, গিয়াসুদ্দিন সৈন্য নিয়ে বাংলা দেশে ছুটলেন। ছেলেকে দিয়ে গেলেন রাজকাজের ভার। ইতিমধ্যে দিল্লীতে গোলযোগ সুরু হলো। বাংলা দেশের লড়াই অসমাপ্ত রেখেই গিয়াসুদ্দিন দিল্লীতে ফিরলেন। লক্ষ্মণাবতী, সোনারগাঁ, ও সাতগাঁ তিনি জয় করেছিলেন, ত্রিহুতের যুদ্ধ তখন চলছিল। সে যুদ্ধ রইল, গিয়াসুদ্দিন ফিরলেন।

জয়ী পিতাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য উলুঘ খাঁ নগর-উপকণ্ঠে একখানি কাঠের মণ্ডপ বানালেন। প্রধান স্থপতি মালিকজাদা আহমদ-বিন-আওয়াজকে উলুঘ নির্দেশ দিলেন যে এমন মণ্ডপ হবে, যে মঞ্চের তোরণে হাতি পা ফেললেই সমস্ত মণ্ডপ ভেঙে পড়বে।

গিয়াসুদ্দিন এলেন। আউলিয়ার শিষ্যেরা বললেন—ফকির সাহেব, সুলতান আপনার উপর বিরক্ত হয়ে আছেন, যে গোলযোগের খবর রটেছে, তার মধ্যে আপনার অনেক শিষ্য-সাগরেদ আছেন, এই সূত্রে

আপনার উপর হয়তো সুলতান কোন অত্যাচার করতে পারেন, আপনি এখান থেকে চলে যান।

আলাউদ্দিন হেসে বললেন—ইয়স্ত দিল্লী দুরস্ত—দিল্লী অনেক দূর—সুলতান আগে দরবারে বসুন তখন দেখা যাবে।

ইতিমধ্যে সুলতানকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। সভার কাজ শেষ হতে না হতেই উলুঘ খাঁ বললেন—নেমাজের সময় হয়ে গেল, এবার মসজিদে যেতে হবে।

বাইরে সাজানো রাজহস্তী দাঁড়িয়েছিল, সেই হাতীকে ভিতরে আনার হুকুম হলো, সুলতান যাবেন। হাতি তোরণে পা ফেলতেই সমস্ত মণ্ডপ মাথার উপর ভেঙ্গে পড়লো, সুলতান চাপা পড়লেন।

হৈ চৈ হলো, কিন্তু সেই কাঠের স্তূপ সরিয়ে সুলতানকে উদ্ধার করার কোন ব্যবস্থাই হলো না সন্ধ্যা অবধি।

সন্ধ্যার পর কাঠকুটো সরিয়ে সুলতানকে উদ্ধার করা হলো। কেউ বলেন—তিনি তখনও জীবিত ছিলেন, কেউ বলেন,—না, তিনি মারা গিয়েছিলেন। তা সে যাই হোক, সেই রাত্রের অন্ধকারেই সুলতানকে তুঘলকাবাদে কবর দেওয়া হয়ে গেল। এই কবর তিনিই নিজের জন্য কাটিয়ে রেখেছিলেন।

তিনদিন পরে উলুঘ খাঁ মহম্মদ-বিন-তঘলুক নামে দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন। দরবারের আমীর ওমরাহেরা পিতৃহত্যার ব্যাপারটা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করলে না।

সমরখন্দের তুর্কী দিগ্বিজয়ী তাইমুর-ই-লং দিল্লীর সুলতান মামুদ শাহ্‌কে হারিয়ে দিল্লী দখল করলো (১২ই ডিসেম্বর, ১৩৯৮)। এক লাখ হিন্দুকে তাইমুর বন্দী করেছিল। দু'জন আমীর এসে তাইমুরকে বললো—এতো বন্দীকে সংযত করে রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তাদের যেমন ভাবগতিক দেখছি তারা যে কোন সময় বিদ্রোহ করে আমাদের ছাউনি লুঠ করতে পারে।

তাইমুর কোন চিন্তা না করে বললো—তাই যদি হয়, তাহলে যত

কাফের আছে সবাইকে কতোল করো। কোন দয়ামায়া দেখানোর দরকার নেই। যদি কেউ বন্দীদের উপর দয়া দেখায় তাহলে তাকেও খুন করবে, তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে।

আর কথা কি! আমীর ওমরাহেরা এক লাখ বন্দীর মাথা কেটে ফেললো।

তাইমুরের দরবারে একজন অতি ধার্মিক পারিষদ ছিলেন, মৌলানা নাসিরুদ্দিন উমর। পণ্ডিত মানুষ, জীবনে কোন পশুপাখীকে তিনি আঘাত করেন নি। আজ তিনিও চুপ করে থাকতে পারলেন না, তিনিও স্বহস্তে পনেরো জন কাফেরকে খুন করলেন।

তারপর সুরু হলো নগর-লুণ্ঠন। তাইমুরের পনেরো হাজার তুর্কী সৈন্য বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার—তিনদিন ধরে দিল্লীর প্রতিটি গৃহ লুঠ করলো। হিন্দু নাগরিকেরা অপমান ও অত্যাচারের ভয়ে বাড়ীতে আগুন লাগালো, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সেই আগুনে আত্মহুতি দিল, আর পুরুষেরা তলোয়ার হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো লুণ্ঠনকারীদের প্রতিরোধ করতে। শত্রুদের হাতেই তারা প্রাণ দিল।

তিনদিন পরে তাইমুর বললো—নগরের এই অশান্তির জন্য আমি দায়ী নই। কাফেররা বিদ্রোহ করতে চেষ্টা করেছিল বলেই এমন ঘটলো। সবই খোদার মর্জি, তাঁর ইচ্ছাতেই সব ঘটেছে, এতে আমার কোন ইচ্ছা নেই, কোন নির্দেশও নেই।

কুড়ি দিন দিল্লীতে থেকে তাইমুর ফিরে যায় (১লা জানুয়ারী, ১৩৯৯)। দিল্লী তখন শ্মশানভূমির মতো। সৈয়দ সুলতানেরা দিল্লীতে রাজত্ব করেন ১৪১৪ সাল থেকে ১৪৫১ সাল অবধি।

—শেষ—